পল্লব সেনগুপ্ত

ঝড়ের পাখি

ঝড়ের পাখি : কবি ডিরোজিও

কবি ডিরোজিও

ঝড়ের পাখি : কবি ডিরোজিও

ড. পল্লব সেনগুপ্ত

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

'Jharher Pakhi : Kavi Derozio' : *Dr. Pallab Sengupta*

A treatise in Bengali on the life and works of H.L.V. Derozio with a selection of his articles and poems along with the translations of the latter, done by the author. Some rare and useful documents regarding Derozio have also been collected in this volume.

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৮০

নূতন সংস্করণ : মার্চ, ১৯৮২

প্রচ্ছদ : ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিকৃতি : ইংরেজ শিল্পী সি. বেনেট কর্তৃক ১৮৪৩ সালে অঙ্কিত

প্রচ্ছদ ও প্রতিকৃতি মুদ্রণ : ইমপ্রেশান হাউস। কলকাতা ৭০০০০৯

প্রকাশক :
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা ৭০০০০৯

মুদ্রাকর :
অজিতকুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০ পটুয়াটোলা লেন। কলিকাতা ৭০০০০৯
ও
পি. আর. এস.
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। কলকাতা ৭০০০০৯

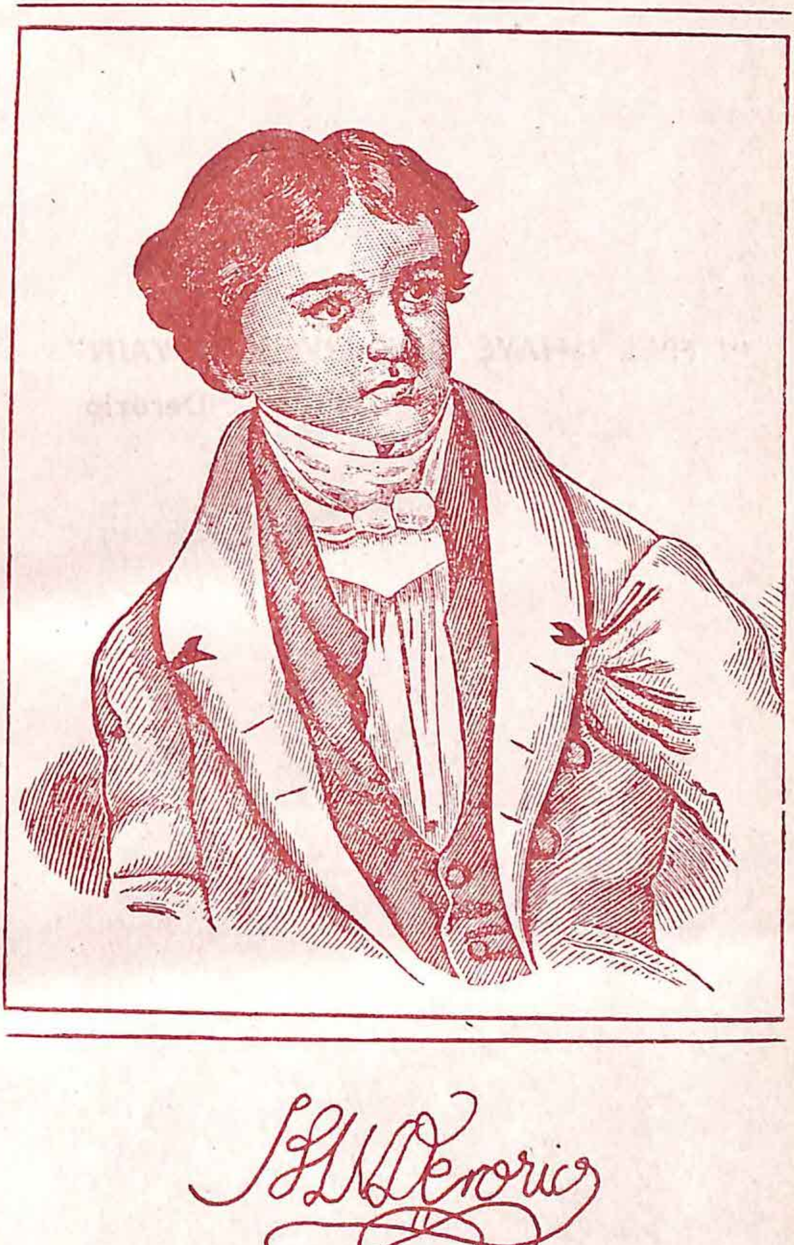
পনের টাকা

ডিরোজিওর বিষয়ে প্রথম যিনি এই লেখককে
আগ্রহী করে তুলেছিলেন, সেই প্রয়াত পণ্ডিত
বিনয় দত্তের
কথা মনে রেখে
আমার সংগ্রামী সহকর্মীদের হাতে

পূর্বকথা

১৯৬৯ সালে প্রকাশিত 'হেনরী ডিরোজিও: কবি ও প্রাবন্ধিক' এবং তার পরের বছরে প্রকাশ-হওয়া 'ডিরোজিওর কবিতা' বই দুটিকে দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু সনৎকুমার মিত্র ও তপোবিজয় ঘোষ এবং অনুজ-প্রতিম অনুপকুমার মাহিন্দারের সপ্রীতি-তাড়নায় একসঙ্গে মিলিয়ে এবং বেশ কিছু অধ্যায় নতুন লিখে যখন এই বই ১৯৭৯ সালের শেষে বার করা গিয়েছিল, তখন সত্যিই ভাবিনি যে দু' বছরের মধ্যে আবার এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে হবে! কিন্তু সেটা বাস্তবে যে ঘটেছে, এ জন্যে বিশেষ করে কাকে যে ধন্যবাদ দেব তাও বুঝতে পারছি না! তবে পাঠকসাধারণ অবশ্যই তার দাবীদার যে, তাতে সন্দেহ নেই। এই সংস্করণের প্রকাশের পিছনেও সেই তিনজন ত আছেনই—তা ছাড়াও আছেন প্রিয় বন্ধু দিব্যজ্যোতি মজুমদার ও ড. দুলাল চৌধুরী। এঁরা ছাড়া কল্যাণীয়া রীতা বসু এবং চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্তের অনেকখানি ভূমিকা আছে এই বই বেরোনোর অন্তরালে।

এই সংস্করণে 'ডিরোজিওর উত্তরাধিকার' অধ্যায়টিতে আরো অনেক বেশি তথ্য এবং বক্তব্য সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। ডিরোজিওর দুর্লভ বেশ-কিছু ইংরাজী প্রবন্ধ এবং কবিতার সংকলন এবারে সংযুক্ত হয়েছে। ডিরোজিও-সম্পর্কিত অনেক তথ্য এবং দলিলও এবারে দেওয়া হল, যার বেশ কটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নানা কারণে দু'একটি মুদ্রণ-প্রমাদ থেকে গেল; এ জন্যে মার্জনা প্রার্থনীয়॥



"I FEEL I HAVE NOT LIVED IN VAIN"

: Derozio

মধ্যযুগকে অতিক্রম করে ভারতবর্ষ আধুনিক পৃথিবীর চিন্তা এবং কাজের সনদ পেয়েছিল এদেশে পাশ্চাত্যের শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে। কিন্তু সেই আদর্শের পত্তনী ইংরেজ তার নিজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে ঘটালেও, ভারতের বৃহত্তর জন-জীবনের সঙ্গে যে তার একটা সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটেছিল এমন কথা বলা যায় না। এমন কী, যে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আধুনিকতার আলোটুকু এসে পড়েছিল, তাকেও সকলে খোলা মনে স্বাগত জানাতে পারেন নি। ফলে, দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও ভাব এবং আদর্শের একটা প্রবল সংঘাত ধীরে ধীরে সঞ্জাত হতে শুরু করেছিল—উনিশ শতকের শুরু থেকেই।

ঠিক এই পরিবেশের মধ্যেই এদেশে নতুন যুগের প্রধান অগ্রনায়কদের অন্যতম হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর জন্ম ও কর্মসাধনার বিকাশ হয়েছিল। আদিতে ডিরোজিওর পূর্বপুরুষরা খুব সম্ভবত পর্তুগাল থেকে এদেশে এসেছিলেন, কোন এক সময়ে। তারপর কালক্রমে তাঁদের সঙ্গে এদেশের মানুষের পারিবারিক সম্বন্ধও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আদিতে পর্তুগীজ হলেও ডিরোজিও পরিবার ধীরে ধীরে 'ইউরেশিয়ান' [বা এখনকার পরিভাষায় 'অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান'; সেযুগে 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' ও বলা হত এঁদের] রূপে পরিচিত হলেন অন্যদের কাছে।

১৫৫, লোয়ার সার্কুলার রোডে এই পরিবারের বাসভবনে হেনরী লুই ভিভিয়ান নামে যে ছেলেটির ১৮০৯ সালের ১৮ এপ্রিল তারিখে জন্ম হয় তিনিই উত্তরকালে এ দেশকে প্রথম জাতীয়তাবাদ এবং প্রগতিশীল সমাজ-চেতনার দীক্ষা দিয়েছিলেন। মাইকেল ডিরোজিও নামে জনৈক পর্তুগীজ 'ব্যবসায়ী ও মুৎসুদ্দী' এবং 'এদেশীয় প্রোটেস্টাণ্ট'-এর দ্বিতীয় পুত্র ফ্রান্সিস ছিলেন হেনরীর পিতা। মায়ের নাম সোফিআ। হেনরীরা ছিলেন পাঁচ ভাইবোন: ফ্র্যাংক, হেনরী, ক্লডিআস, সোফিআ এবং আমেলিআ। হেনরীর যখন ছ-বছর বয়স, তখন তাঁর মায়ের জীবনাবসান ঘটলে ফ্রান্সিস দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন আনা রিভার্স নাম্নী জনৈকা ইংরেজ ভদ্রমহিলাকে। এঁর আর কোনো সন্তান হয়নি। ১৮৫১ সালে আনার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ডিরোজিও-পরিবারের বিলুপ্তি ঘটে।

১৮১৫ সালে হেনরী ভর্তি হলেন স্কটিশ-শিক্ষাবিদ্ ডেভিড ড্রামণ্ডের ধর্মতলা অ্যাকাডেমীতে। ড্রামণ্ড সম্বন্ধে এই বইয়ের অন্যত্র আমাদের বিস্তৃত আলোচনা

করতে হবে। কারণ ড্রামণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন ডিরোজিও। বিদ্যালয়ে এই আট বছর ধরে পড়াশুনো করার পর ডিরোজিও প্রবেশ করতে বাধ্য হলেন কর্মজীবনে : ততদিনে তাঁর পিতৃবিয়োগও হয়েছে। অল্প কিছুদিন তিনি প্রয়াত-পিতার কর্মস্থল জেমস স্কট অ্যাণ্ড কোম্পানীতে [ফ্রান্সিস এঁদের মুখ্য হিসাবরক্ষক ছিলেন] করণিক হিসেবে যোগ দিলেন। সেখানে বছর দুয়েক থেকে তাঁর মামা [এবং পিসেমশাইও বটে] আর্থার জনসন নামে জনৈক নীলকুঠির মালিকের ব্যবসায়ে যোগ দিতে ভাগলপুরে চলে যান ডিরোজিও। তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাতও ঐ খানেই।

ভাগলপুর থেকে ডিরোজিও কলকাতার 'ইণ্ডিআ গেজেটে' মাঝে-মাঝেই কবিতা লিখে পাঠাতেন প্রকাশের জন্য। ঐ পত্রিকার সম্পাদক ড. জন গ্র্যান্ট ডিরোজিওকে ছাত্রাবস্থা থেকেই চিনতেন ড্রামণ্ডের বিদ্যায়তনের সেরা পড়ুয়া হিসেবে। গ্র্যাণ্টের প্রযত্নেই ডিরোজিও কলকাতার সাংস্কৃতিক জগতে পরিচিত হতে শুরু করলেন ঐ পত্রিকার মাধ্যমে। এখানে তাঁর জীবনে একটি ব্যর্থ-প্রণয়ের ঘটনাও ঘটে যায়।

অনেকটা গ্র্যাণ্টের উৎসাহেও বটে, আর বৃহত্তর কর্মসাধনার আহ্বানেও বটে, ডিরোজিও নীলকুঠির কাজ ছেড়ে কলকাতায় ফিরে এলেন ১৮২৬ সালের গোড়ার দিকে এবং ঐ বছরেরই মে মাসের হিন্দু কলেজের ইতিহাসে দেখা গেছে : 'ইংরাজী পাঠশালায় ডিয়রম্যান নামক একজন গোরা আর ডি রোজী সাহেব এই দুই নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।' ১৩ মে তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা অথবা অন্য কেউ কি তখন ভাবতে পেরেছিল যে বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতির আকাশের ঈশান কোণে সেদিন থেকে ঝড়ের সূচনা হল!

ঝড় উঠতে অবশ্য বেশী দেরী হল না। ডিরোজিওর ছাত্ররা [যাঁরা অনেকেই তাঁর প্রায় সমানবয়সী ছিলেন] তাঁর কাছ থেকে এমন এক শিক্ষার সম্পদ অর্জন করলেন, যা তাঁদের মাধ্যমে এদেশের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মনোলোককে এক উজ্জ্বল আভায় উদ্ভাসিত করে তুলল। ডিরোজিওর শিক্ষায় তাঁরা এমন ভাবেই যুক্তিবাদী এবং বিচারনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন যে, রক্ষণশীল সমাজপিতারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন নিজেদের কায়েমী স্বার্থের দুর্গগুলি পাছে ভেঙে পড়ে, এই ভয়ে।

ইতিমধ্যে ডিরোজিওর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দি পোএমস' প্রকাশিত হয়েছে ১৮২৭ সালে। দ্বিতীয় বই 'দি ফকীর অব জঙ্গীরা অ্যাণ্ড আদার পোএমস' বেরোয়

তার পরের বছর। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়-প্রমুখ ছাত্রদের নিয়ে প্রকাশ করলেন তিনি 'পার্থিনন' নামে সাময়িক পত্রিকা—যা ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠিত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিএশনের মুখপত্র স্বরূপ।

সমাজপিতাদের পাল্টা আঘাত এইখান থেকেই শুরু হল। 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' পত্রিকায় পরিবেশিত তথ্য থেকে এসম্বন্ধে ভাল করেই জানা যায়। ১৮৪২ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখে ঐ পত্রিকায় 'পার্থিনন' প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল: 'হিন্দু ধর্মাবলম্বি মহাশয়েরা তদ্দর্শন মাত্রে…স্ব ২ ধন ও পরাক্রমানুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করত তাহা রহিত করিয়াছিলেন ও তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা যাহা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল তাহাও গ্রাহকদিগের নিকট প্রেরিত হইতে দেন নাই…।'

'পার্থিনন' এইভাবে রুদ্ধবাক্ হয়ে গেলে, ডিরোজিও এবং তাঁর ছাত্রদলরা মিলে, 'হেসপেরাস' নামে আর একটি বার্ষিক সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েও, কিছুকাল পরে সেটিও অনুরূপ কারণে বন্ধ করতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে 'ক্যালিডোস্কোপ' নামে আরো একটি পত্রিকাও ডিরোজিও সম্পাদনা করেছিলেন।

এই সামাজিক-সংঘর্ষের পটভূমিকা যে কি ছিল, এখানে সেটি বিশ্লেষণ করা দরকার। কি কলেজের ক্লাসে, কি ক্লাসের বাইরে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিএশনের সভায় ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের মনে যে জিনিষগুলি গেঁথে দিতে প্রয়াসী হতেন, তা হল এই: এক. স্বাদেশিকতার প্রেরণা; দুই. বিশ্বতোমুখিন দৃষ্টিভঙ্গী; তিন. নিরীশ্বরবাদী যুক্তিনির্ভরতা এবং সর্বোপরি, চার. যাবতীয় অন্ধ ও পশ্চাৎমুখী সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো ক্ষমতা। এই সব কটি ভাব-প্রেরণার সমন্বয়েই ডিরোজিও এদেশের বুকে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন 'এজ্ অব রিজ্ন'।

গুরুর চিন্তায় ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 'ইঅং বেঙ্গল'-নামে সাধারণভাবে পরিচিত তাঁর ছাত্রদল সেদিন প্রচলিত সামাজিক অপ-সংস্কারের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছিল। সেই বিদ্রোহ সে দিনে, কিংবা পরবর্তীকালে সার্বিকভাবে একটা সামাজিক বিপ্লবে পরিণতি না পেলেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো পরিপূর্ণ 'এনসাইক্লোপীডিস্ট', রাধানাথ শিকদারের মতো গণিতবিদ্, রামগোপাল ঘোষের মতো বাগ্মী ও জননেতা, রামতনু লাহিড়ীর তুল্য চিন্তাবিদ্, তারাচাঁদ

চক্রবর্তী এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের মতো রাজনীতি-সচেতন বুদ্ধিজীবীরা তাঁরই শিক্ষার অগ্নিতে প্রজ্বালিত চিন্তার মশাল ধরিয়ে নিয়ে চলেছিলেন সেই যুগের অন্ধ-সংস্কার-ক্লিন্ন সমাজের পথে।

অতএব রক্ষণশীলদের মহলে 'সামাল! সামাল!' রব স্বাভাবিক কারণেই উঠেছিল: ১৮২৭-২৮ সাল থেকেই অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিএশ্যন তাঁদের অস্থিতে শীতলতার কাঁপন ধরাতে শুরু করেছিল; ১৮২৯ নাগাদ তাঁদের নিজেদেরকে বাঁচানর জন্যে জোট তৈরী হতে লাগল—ঐ যৌবন-জল-তরঙ্গকে রুখবার জন্য। উনিশ শতকের বাংলা দেশের সামাজিক পটভূমিতে প্রধানত তিনটি ধারা প্রবহমান। একদিকে রক্ষণশীল সমাজপিতারা: প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, রসময় দত্ত, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। দ্বিতীয় দলে নাম করা যায় মধ্যপন্থী হিসেবে যাঁরা গণ্য তাঁদের; ডিরোজিওর সমকালে এঁদের প্রধান-পুরুষ ছিলেন স্বয়ং রামমোহন। তৃতীয় দলের অধিনায়ক ডিরোজিও। সেনানী-মণ্ডলী তাঁর ছাত্রগোষ্ঠী।

সমাজতত্ত্বের অনিবার্য শর্তেই রক্ষণশীল গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রগতিমুখিন দলের সংঘর্ষ যখন অনিবার্য হয়ে উঠল, তখন মধ্যপন্থীরা অন্তত কর্মপদ্ধতিগত ভাবে প্রগতিপন্থীদের কাছাকাছি আসেন। উনিশ শতকের বাংলা দেশের এই সামাজিক সংঘাতের মঞ্চভূমিতেও এই জিনিষ অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল। ডিরোজিও-শিষ্য কৃষ্ণমোহনের লেখা 'দি পার্সিক্যুটেড' নাটকে তার চিত্রায়ন ঘটেছে। 'পার্থিনন' এবং 'হেসপেরাস' সমাজপতিদের ক্রোধের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারলেও কৃষ্ণমোহনের 'এনকোয়্যারার' পত্রিকা এবং ইঅং বেঙ্গলের একটি মুখপত্র আর 'জ্ঞানান্বেষণ' তত স্বল্পজীবী হয়নি। এই পত্রিকা দুটির পাতায় ঐ দ্বন্দ্বের ইতিহাস সুন্দরভাবে তথ্যবদ্ধ হয়ে আছে। ডিরোজিও 'ইস্ট ইণ্ডিআন' নামেও একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন হিন্দু কলেজ থেকে 'ছাঁটাই' হবার পর; তার মধ্যেও ইঅং বেঙ্গলের বক্তব্য নথিভুক্ত হয়ে আছে। কিন্তু সে কথার আগে কোন্ পরিস্থিতিতে ডিরোজিও 'ছাঁটাই' হলেন সেটা অনুধাবন করা দরকার।

ডিরোজিওর প্রভাব এবং মর্যাদা তরুণ সমাজে ক্রমবর্ধমান দেখে হিন্দু কলেজের পরিচালকদের রক্ষণশীল অংশ উত্তরোত্তর শঙ্কিত হয়ে উঠতে লাগলেন এবং কলেজ থেকে তাঁকে সরানোর জন্যে চক্রান্ত শুরু করলেন। ডিরোজিওকে

প্রথম ধাক্কাটা সরাসরিভাবে দেওয়া না হলেও, হল পরোক্ষ ভাবে, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিএশ্যনের কাজকর্মের ব্যাপারে একটা হুঁশিয়ারী জারী করে : "The Management of the Anglo-Indian College, having heard that several of the students are in habit of attending Societies at which political and religious discussions are held, think it necessary to announce their strong disapprobation of the practice and to prohibit its continuance. Any student being present at such a society after the promulgation of this order will incur their serious displeasure." [হিন্দু কলেজ পরিচালক সমিতির কার্যবিবরণী]

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিএশ্যন এবং তার ছকে-গড়ে-ওঠা অনুরূপ আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান-সম্পর্কে এই হুঁশিয়ারী কিন্তু অবস্থার বিশেষ হেরফের ঘটাতে পারল না। ফলে কর্তৃপক্ষ এবার সরাসরিই ডিরোজিওর বিরুদ্ধতায় প্রবৃত্ত হলেন।

সুযোগও মিলে গেল সহজেই। ডিরোজিওর সঙ্গে 'ইণ্ডিআ গেজেট' পত্রিকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা কারুরই অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষের ঐ নির্দেশনামাকে তিক্ত ও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ বেরোয়, তাঁরা সেটি ডিরোজিওরই লেখা সাব্যস্ত করে নিয়ে তাঁকে বিতাড়ন করতে মনস্থ করলেন।

১৮৩১ সালের ২৩ এপ্রিল তারিখে পরিচালক সমিতির সভায় সুদীর্ঘ বিতর্কের শেষে ভোটের জোরে সনাতনীরা ডিরোজিওকে কর্মচ্যুত করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু ইতিহাসের পরিহাস এইটাই যে, যে নগণ্য 'উঠ্‌তি মুৎসুদ্দীরা' ডেভিড হেয়ার, হোরেস হেম্যান উইলসন, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ প্রমুখ যথার্থ বিদ্যাব্রতীদের ভোটের জোরে পরাস্ত করে ডিরোজিওকে কলেজ থেকে তাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন, মহাকালের সম্মার্জনীর তাড়নায় তাঁরা অনেকেই আজ বিস্মৃতির জঞ্জালে মিশে গেছেন। রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নাম যদিবা আমরা ক্বচিৎ কখনো অন্যত্রও ইতিহাসের চর্চা করতে গিয়ে স্মরণ হয়ত করি, কিন্তু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, রসময় দত্ত প্রমুখের কথা ত তাঁদের ঐ 'সুমহৎ'-অপকীর্তির প্রসঙ্গ ছাড়া আর কোনো উপলক্ষে মনে পড়বার হেতু নেই!

কিন্তু ডিরোজিওকে সরাসরি 'ছাঁটাই'-নোটিশ জারী করার সাহস এঁদের হয়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠের নির্দেশে উইলসন বাধ্য হলেন, পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ

থেকে ডিরোজিওর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ তৈরী করা হয়েছিল, সেগুলি সমেত তাঁকে একটি চিঠি লিখতে, যাতে তাঁকে পদত্যাগপত্রও দাখিল করতে বলা হয়েছিল ॥ ঐ চিঠিতে ডিরোজিওর বিরুদ্ধে মূলত এই তিনটি গুরুতর অভিযোগ সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

১. তিনি তাঁর ছাত্রদের নিরীশ্বরতাবাদে দীক্ষিত করে থাকেন কি-না ?
২. তিনি ছাত্রদের কাছে পিতামাতার অবাধ্য হবার স্বপক্ষে কিছু বলেন কি-না ?
৩. তিনি ছাত্রদের কাছে ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে হবার সমর্থনে কিন্তু প্রচার করেন কি-না ?

ন্যক্কারজনক তৃতীয় অভিযোগটিকে ঘৃণার সঙ্গে অস্বীকার করে, দ্বিতীয়টিকে তথ্য-প্রমাণ দিয়ে খণ্ডন করে, এবং প্রথমটি যুক্তি এবং সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে নিজের যথার্থ ভূমিকাটিকে প্রতিষ্ঠা করে ডিরোজিও পদত্যাগপত্র পাঠালেন আনুষ্ঠানিকভাবে এবং উইলসনের কাছে ব্যক্তিগতভাবে। উইলসনের কাছে ২৬. ৪. ১৮৩১ তারিখে লেখা চিঠিতে তিনি যাঁরা তাঁকে পরিচালক পর্ষদের সভায় সমর্থন করেন, তাঁদের প্রতি তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি যে কথাগুলি বলেন, তা অত্যন্ত মূল্যবান্, কারণ কেবলমাত্র হিন্দু কলেজের কর্তাদের অনৃতভাষণের বিরুদ্ধে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, শুধু সেইটুকুই নয়, তাঁর নিজস্ব ধ্যান ও উপলব্ধি কি ছিল এ সম্বন্ধে, সেটাও এর মধ্যেই সংবদ্ধ রয়েছে। পরবর্তী সময়ে কোনো কোনো জীবনীকার তাঁকে নিষ্ঠাবান্ খৃস্টধর্মাবলম্বী এবং সুগভীর ঈশ্বরপ্রত্যয়ী বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন বলেই এই প্রসঙ্গের আলোচনা ডিরোজিওর জীবনী বর্ণনা উপলক্ষে বিশেষ ভাবে করতে হবে।

ঐ চিঠিতে ডিরোজিও এ প্রসঙ্গে মূল কথা যা বলেছিলেন, তা হল এই : 'আমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব বিষয়ে কোনো পক্ষেই প্রচার করিনি। কিন্তু এ বিষয়ে মুক্ত-যুক্তির আলোচনাকে আমি সর্বদাই উৎসাহ দিয়েছি। কোনো গূঢ় সত্যভিত্তিক মৌল তত্বকে আমি পূর্বাভিমান-নির্ভর বলে মনে করিনি এবং আমার ছাত্রদের মনে করাতে চাইনি। যুক্তির পথ বেয়ে যে যেমন সিদ্ধান্তে পৌছতে পেরেছে, আমি তাকে সে পথেই এগিয়ে দিয়েছি। একে কেউ হয়েছে নাস্তিক, কেউ বা আস্তিক। আমার নিজস্ব অভিমত কারুর উপলব্ধির ওপরে আরোপ করিনি। হিউম-প্রমুখ নিরীশ্বরবাদীরা যা বলেছেন এবং রীড-প্রমুখ আস্তিক্যপন্থীরা যা শিখিয়েছেন সবই আমার ছাত্ররা জেনেছে এবং

নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিশীলিত করেছে। এই মুক্তবুদ্ধির উন্মেষই আমার মূল অভীষ্ট।' স্পষ্টতই, ডিরোজিওর এই দৃষ্টিভঙ্গী উইলসনের কাছে সমাদৃত হলেও, হিন্দু কলেজের অধিকাংশ পরিচালকের কাজেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। সুতরাং ডিরোজিওর 'বাধ্যতামূলক পদত্যাগপত্র' স্বচ্ছন্দভাবে গৃহীত হয়ে গেল।

ভারতবর্ষের প্রথম 'ছাঁটাই শিক্ষক' হেনরী ডিরোজিও হিন্দু কলেজের সিংহদ্বারের বাইরে এসে দাঁড়ালেন নিজের বাইশ বছর পূর্ণ করার কদিন পরেই। তরুণ অধ্যাপকের সঙ্গে রইলেন তরুণ ছাত্ররা। সামাজিক ন্যায়নীতির স্বনিযুক্ত অভিভাবকদের ক্রোধ এতেও প্রশমিত হল না। ডিরোজিও-পন্থীদের অনেকই এঁদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে পারিবারিক শাস্তির সম্মুখীন হলেন। 'পার্সিকুটেড' নাটকে [১৮৩১] কৃষ্ণমোহন সে চিত্র অঙ্কন করেছেন, নিজে বাড়ি থেকে বিতাড়িত হবার পরে। ঐ বছরের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহের 'এনকোঅ্যারার' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে সকলকে সচকিত করবার জন্য লেখা হল: 'The rage of persecution is still vehement. The bigots are up with their thunders of fulmination. ....The orthodox are in a rage ; let them burst forth into a flame.'

গোঁড়াদের ঐ ক্রোধের আগুন বেড়াজালের মতো ঘিরে ধরতে চাইল ডিরোজিও এবং ডিরোজিআনদেরকে। জীবিকার একটা প্রয়োজন ছিলই: কিন্তু এত সবের পরে ডিরোজিওর পক্ষে আর কোনো প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়াও সম্ভব ছিল না। তাছাড়া নিজের কথা সাধারণ্যে প্রচার করারও একটা াধ্যম প্রয়োজন। অতএব প্রকাশিত হতে লাগল 'ইষ্ট ইণ্ডিআন' পত্রিকা ; 'সমাজের সর্বশ্রেণীর সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার' উদ্দেশ্য নিয়ে।

কিন্তু একদিকে সামাজিক সংঘর্ষের উত্তাপ, অন্যদিকে দারিদ্র্যের পীড়ন। এদের মাঝখানে শুধু একমুঠো তরুণ প্রাণের শ্রদ্ধা-প্রীতি-অনুরাগ সম্বল করে এই রূঢ় গদ্যময় পৃথিবীতে অস্তিত্ব বজায় রাখা নিতান্তই অসম্ভব। দারিদ্র্য নামে একটি অনারোগ্য ব্যাধি নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে আরো অজস্র উপব্যাধিকে। এদেরই একটির আক্রমণে ১৮৩১ সালের শেষ দিকে ডিরোজিও শয্যাগত হলেন। এই উপব্যাধিটির অভিধানিক নাম কলেরা মর্বাস।

কিন্তু দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতেও ডিরোজিও তাঁর সাধনার পথ থেকে একটুও সরে যান নি। শুধু 'ইস্ট ইণ্ডিআন' পত্রিকা সম্পাদনা করেই তিনি সত্য, যুক্তি এবং স্বাধীন চিন্তার মশালকে জ্বালিয়ে রাখেন নি ;

'এনকোআ্যারার', 'ইণ্ডিআ গেজেট', 'বেঙ্গল অ্যান্থআল অ্যাণ্ড লিটেরারী কিপসেক,' 'বেঙ্গল জুর্নাল,' 'দি ক্যালকাটা ম্যাগাজিন,' 'দি ক্যালকাটা লিটেরারী গেজেট,' 'দি ইণ্ডিআন ম্যাগাজিন'—প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কলম অবিরলভাবে গদ্য-পদ্য সৃষ্টি করে গেছে। পটলডাঙার হিন্দু কলেজের দরজা তাঁর সামনে বন্ধ করে দেওয়া হলেও, তাঁর মৌলালির বাড়িতে ছাত্রদের হাজিরা একটুও কমেনি ; মানিকতলার বাগানের ধারে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিএশ্যনের সভা চলেছে যথারীতি।

আর যথারীতি রক্ষণশীল হিন্দুসমাজপিতারা ডিরোজিওর, তাঁর বোন আমেলিআর এবং তাঁর ছাত্রদের চরিত্র হনন করে গেছেন। এরই মধ্যে অবিচল ভাবে চলেছে সব কিছু। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ডিরোজিও পেরেণ্টাল আকাদেমীর বার্ষিক পরীক্ষা নিলেন আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসেবে। ১৭. ১২. ১৮৩১ তারিখে 'ইস্ট ইণ্ডিআন' পত্রিকায় ঐ পরীক্ষা প্রসঙ্গে প্রতিবেদন করতে গিয়ে ডিরোজিও জীবনে শেষবারের মতো কলম ধরলেন। তিনি লিখলেন : "The most pleasing feature in this institution is its freedom from illiberality." ঐ লেখায় ডিরোজিও সমগ্র ইউরেশীয় সমাজের প্রতি আহ্বান জানালেন ভারতীয় জনগণের বৃহত্তর প্রবাহের সঙ্গে মিশে যেতে। এবং এমন সামগ্রিক বোঝাপড়াতেই যে এদেশের যথার্থ হিতসাধন, হবে এমন কথাই বলেছিলেন ডিরোজিও ঐ নিবন্ধে।

এই স্বদেশ-চেতনা তাঁর শেষ শয্যাতেও ছিল অনাহত। ঐ ১৭ ডিসেম্বর তারিখের সন্ধ্যাতেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন আকস্মিক ভাবে। কয়েক দিনের মধ্যেই ব্যাধি করাল চেহারা ধারণ করল। মৃত্যু ধীরে ধীরে অধিকার করতে শুরু করল সাড়ে বাইশ বছরের ঐ যুগস্রষ্টা তরুণ অধ্যাপকের দারিদ্র্য-দীর্ণ দেহকে। কিন্তু অপরাজেয় তাঁর সত্তা ; দুর্দম তাঁর আশাবাদী মন। হয়ত সেই অপরাভবী আশারই প্রতীক-রূপে প্রতিভাত হয়েছিল তাঁর শেষ অভীপ্সা। ক্যামবেলের 'প্লেজার্স অব হোপ' কবিতা শুনতে চাওয়া। ঐ কবিতায় ১৭৯৯ সালে ক্যামবেল স্বপ্ন দেখেছিলেন ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীন হবে! স্বাধীনতার সেই স্বপ্ন দেখতে দেখতেই এদেশে স্বদেশবোধের প্রথম পুরুষ হেনরী লুই ভিভিআন ডিরোজিও বাইশ বছর আট মাস বয়সে পৃথিবীর রণক্ষেত্র থেকে সরে গেলেন। সেদিনের তারিখ ছিল ২৬. ১২. ১৮৩১। আজ থেকে ঠিক দেড়শ বছর আগে।

সৃষ্টি

এক.

হেনরী লুই ভিভিআন ডিরোজিওকে আমরা কেবল নব্যবঙ্গের দীক্ষাগুরু হিশেবেই ভাবতে অভ্যস্ত; একটি প্রতিভাশালী প্রজন্মের অনুপ্রেরণাদাতা ও অধ্যাপক রূপেই তাঁর খ্যাতি। ফলে, কবি হিসেবে তাঁর মূল্যায়নটুকু এখনো অপূর্ণ থাকায়, তাঁর আর-একটি সত্তা আমাদের কাছে আজো অপরিচিত।

পরবর্তীকালে ডিরোজিও অবশ্য এদেশের সামাজিক ইতিহাসে স্থায়ী আসন পেয়েছেন। কিন্তু তাতেও তাঁর প্রতি পুরোপুরি সুবিচার করা হয়েছে বলে ভাববার কারণ নেই। ডিরোজিও সম্পর্কে এদেশের মানুষ অবিচার কম করেনি; প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর চক্রান্তে বিভ্রান্ত হয়ে তারা তাঁর জীবিকার্জনের পথ বন্ধ করেছিল; তাঁর মৃত্যুর পর স্মৃতিরক্ষার ছুতোয় তাঁর নামে চাঁদা তুলে সে টাকা তছরূপ করেছিল; তাঁর বাসগৃহটি এখন বিস্মৃত; এমন কি, তাঁর কবরটিও এই সেদিন পর্যন্ত পরিত্যক্ত সমাধিভূমির কোন্ একান্তে অবহেলিত ও অপরিজ্ঞাত হয়ে পড়ে ছিল তার খবরই বা আমরা ক-জন রেখেছি! এদেশের আধুনিক সংস্কৃতির প্রধানতম অগ্রনায়ক যিনি, তাঁর প্রতি এই হল আমাদের জাতীয় কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য নিবেদনের নমুনা! উত্তরকালের সামাজিক ইতিহাসে তাঁর অবদান এখন কিছুটা স্বীকৃত হলেও, আমাদের জাতীয়-পাপস্খালন তবু অসমাপ্ত থাকবেই, যদি তাঁর কবিপ্রতিভার পূর্ণায়ত মূল্যায়ন আজো না করি। সে প্রসঙ্গে ডিরোজিওর প্রতিভার মূল্যায়নের পটভূমিতে তাঁর শিক্ষক ডেভিড ড্রামণ্ডের অবদানটুকু অবশ্যই সর্বাগ্রে বিচার্য। বাংলাদেশের আধুনিকতার অগ্রপথিক ডিরোজিওর প্রসঙ্গে তাঁর গুরু ড্রামণ্ড সাহেবের ওই পরিচয়টি দেওয়া খুবই প্রয়োজনীয়।[১]

১৮১৩ সালে এই 'কুঁজো স্কচম্যান' কলকাতা শহরে এসে পৌছন এবং অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর একদা বিখ্যাত ধর্মতলা একাডেমী। প্রগাঢ় পণ্ডিত, বিদগ্ধ শিক্ষক, ক্ষুরধার তার্কিক, কবি এবং সুগভীর রসবোদ্ধা এই মানুষটি বাল্যকালেই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রের মননে নিজের প্রতিভার সবকটি বীজই বুনে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। দর্শনচিন্তায় ড্রামণ্ড ছিলেন ঘোরতর যুক্তিবাদী ডেভিড হিউমের অনুগামী; ঈশ্বর-চিন্তার চেয়ে মানবধর্ম যে মহত্তর, এই চিন্তাধারা ডিরোজিও অর্জন করেছিলেন তাঁর অধ্যাপকেরই শিক্ষাতেই। আর এই হল তাঁর কাব্যেরও মূল স্বরলিপি।

ড্রামণ্ড সম্বন্ধে আরো তুটি কথা বিশেষ উল্লেখ্যঃ সে আমলের অন্যান্য বিদ্যালয়ে যখন ডাইসের 'স্পেলিং বুক' পড়িয়ে ইংরেজী শেখানো হচ্ছে,[২] ড্রামণ্ড তখন তাঁর ছাত্রদের নিয়ে যাচ্ছেন শেকসপীআরের মর্মলোকে।[৩] দ্বিতীয়ত, সে আমলে কেবলমাত্র তাঁর স্কুলে এবং শেরবোর্ন সাহেবের স্কুলেই ইউরোপীয় ছাত্রদের সঙ্গে এদেশী ছাত্ররাও সমান অধিকারে প্রবেশ এবং শিক্ষালাভ করতে পেতেন। এই তুটি বিষয় থেকেই শিক্ষক হিসেবে ড্রামণ্ডের অসাধারণত্ব এবং আর্দশবোধের স্বরূপটুকু উপলব্ধি করা সম্ভব হবে—যা কি-না ডিরোজিওর দৃষ্টিভঙ্গীরও নির্ণায়ক।

১৮১৮ সাল থেকেই ডিরোজিওর নাম সংবাদপত্রের পাতায় খুঁজে পাই আমরা। ভালো ছাত্র হিসেবে, অভিনেতা হিসেবে তিনি তখন খ্যাতি অর্জন করছেন ক্রমশ! অতঃপর, ১৮২৪ সালের জানুআরি মাসের এক সংবাদ-অনুযায়ী কবি হিসাবেও তাঁর পরিচিতি পাওয়া যায়।[৪] বিতর্কিত-পরিচয় জনৈক রামরতন চক্রবর্তীকে[৫] বাদ দিলে, ইংরেজী কাব্যচর্চায় বাঙালীর এই প্রথম অভ্যুদয়। কবিতাটি খুব একটা উল্লেখযোগ্য কিছু না হলেও, একজন অল্পবয়সী কিশোরের পক্ষে যথেষ্টই পরিণত। কবিতাটি শুরু হয়েছে এই ভাবে:

"As new fledg'd birds, while yet unus'd to soar,
Tremble the airy regions so explore...."

তরুণ ছাত্রদের উদ্দেশে ব্যবহৃত এই রূপকল্পটির মাধ্যমে ডিরোজিও নিজেদেরকেই বোঝাতে চেয়েছেন; তাঁর কাব্যজীবনের শেষপর্বে লেখা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণমূলক সনেটটিতেও এই চিত্রকল্পটিই আবার ফিরে এসেছে। চিত্রকল্পের এই আবর্তন তাঁর কাব্যমননের একটি নিটোলরূপকে প্রকাশ করেছে, এমন কথা ভাবা চলে।

ছাত্রজীবনের শেষে, ভাগলপুরে প্রবাসী হয়েছিলেন ডিরোজিও। এইখানে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গিয়ে, সৃজনী ক্ষমতা পরিণতির পথ ধরলো। গঙ্গার প্রবাহ; ভাগলপুরের নিসর্গ-সৌন্দর্য, মুঙ্গের-ডালটনগঞ্জের পর্বতশ্রেণী, রাজমহলের নিঃসঙ্গরূপ—সব মিলিয়ে বিহারের গাঙ্গেয় অঞ্চলের এই রুক্ষকোমলরূপে মুগ্ধ হয়ে ডিরোজিওর কবি-প্রতিভার বিকাশ ঘটল কলকাতার 'ইণ্ডিআ গেজেট' পত্রিকার পাতায়। তিনি ওখান থেকে এই সব কবিতা [এবং কিছু গদ্য প্রবন্ধও] পাঠাতে লাগলেন 'জুভেনিস,' 'হেনরী,' 'ইস্ট ইণ্ডিআন' প্রভৃতি ছদ্মনামে। লেখাগুলি সমাদৃত হল ঐ পত্রিকার পাঠকমহলে।

এরপর কলকাতায় ফিরে এসে হিন্দু কলেজে যোগ দেবার ঠিক এক বছর পরে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পোএমস' [১৮২৭]। তার এক বছর পরে বেরোয় তাঁর একদা বিখ্যাত আখ্যান-কাব্য 'দি ফকীর অব জঙ্গীরা'-সহ আরো কতকগুলি খণ্ড-কবিতা [১৮২৮]। গ্রন্থাকারে ডিরোজিও আর কিছু প্রকাশ না করলেও তাঁর সাহিত্যচর্চা বরাবরই অব্যাহিত ছিল—যার প্রমাণ সেকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কাব্যসংকলনেও তাঁর কিছু কিছু কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে!

সে আমলে ডিরোজিওর কবিতাকে মূলত, তখন প্রচলিত জনপ্রিয় ইংরেজ কবিদের অনুকৃতির প্রয়াস হিসেবেই গণ্য করা হত। আশ্চর্যের বিষয় যে, এদেশবাসী ইংরেজ সাহিত্যরসিকরা এই অদ্ভুত গবেষণা শুরু করলেও, এ দেশের বিদগ্ধজনেরাও তার প্রতিবাদ করেন নি! তাঁর অনেক কবিতার মুখপাতে সেকালীন রীতিমাফিক জনপ্রিয় কবিদের লেখা থেকে দু-চার লাইন করে উদ্ধৃতি দেবার অভ্যাস লক্ষ্য করা যায়; হয়ত এইটাই তাঁর সম্বন্ধে এই অমূলক গবেষণার প্রধান কারণ! অবশ্য এই সব কবিদের, অর্থাৎ বাইরন, মূর, ক্যাম্বেল, এল-ই-এল—প্রমুখের কাব্যপ্রেরণার আভাস মাঝে মাঝেই তাঁর কবিতায় যে লাগেনি এমন কথা বলছি না। সমসাময়িক ইংরেজ কবিদের সম্পর্কে একটি নিবন্ধও[৬] লিখেছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁদের চেয়ে ভারতীয়তার আদর্শই তাঁকে অনেক বেশী প্রভাবিত করেছিল। বরং তাঁর কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব যা পড়েছে, তা মূলত ইতিহাসবোধ ও দর্শনচিন্তায়। হিউম, বেকন, মোপার্তুই, কাণ্ট-প্রমুখের সম্পর্কে[৭] তাঁর গভীর অধ্যয়ন ছিল, যার ফলে তাঁর কাব্যের সর্বত্রই একটা সুগভীর মানবমুখিন সহানুভূতি দেখতে পাই। ইউরোপের ইতিহাস তাঁকে পড়াতে হত হিন্দু কলেজে—তা ছাড়া, তার আগে থেকেই সে বিষয়ে তাঁর অনুরাগ দেখা যায়। হিন্দু কলেজে ইউরোপীয় ধ্রুপদী সাহিত্যও তাঁকে পড়াতে হয়েছে; তাঁর লেখার 'ইউরোপীয়তা'-র অন্যতম ক্ষীণ উৎস হিসেবে সেটুকুকেও গণ্য করা চলে।[৮]

মোটামুটিভাবে ডিরোজিওর কবিতাকে এই কয়েকটি মূল ধারায় বিভক্ত করা যায়: ক. ভারতীয়, খ. ইউরোপীয়, গ. সর্বমানবীয়, ঘ. ব্যক্তিগত এবং ঙ. বিচিত্র। তাঁর প্রধানতম সৃষ্টি 'দি ফকির অব জঙ্গীরা'-কে ভারতীয় পর্যায়ের সার্থকতম ফসল বলে গণ্য করতে পারি। এ ছাড়া, 'ঐ ইণ্ডিআ—মাই নেটিভ ল্যাণ্ড', 'দি হার্প অব ইণ্ডিআ', 'এনচ্যাণ্ট্রেস অব দি কেভ', 'দি রুইন

অব রাজমহল', 'সং অব অ্যান ইণ্ডিআন গার্ল', 'সং অব হিন্দুস্তানী মিনস্ট্রেল', 'অন দি অ্যাবলিশন অব সতী', 'ডেভিড হেআর' প্রমুখ কবিতা এই পর্যায়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। ইউরোপীয় পর্যায়ের কবিতাগুলিকে বিভিন্ন উপপর্যায়ে ভাগ করা চলে: 'থার্মপলি', 'গ্রীস', 'দি গ্রীকস অ্যাট ম্যারথন', 'দি গ্রীসিআন সাআর অ্যাণ্ড দি সন', 'অ্যাড্রেস টু দি গ্রীকস', 'সাফো' ইত্যাদি [গ্রীক]; 'ইতালী', 'তাসো', 'এনেকডেট অব ফ্রান্সিস ওআন', ইত্যাদি [ইতালীয় ফারসীয়,]; 'এ সং টিউনড টু পর্টুগীজ এআর', 'এ পর্টুগীজ সং' [পর্তুগীজ]; 'রোমিও আণ্ড জুলিএট', 'য়োরিকস স্কাল', [শেকপীআরীয়]; 'নিউ আটলান্টিস', 'লাভ'স ফার্স্ট ফীলিংস', 'গোল্ডেন ভাস' ইত্যাদি [সমকালীন ইংরেজীকাব্যাশ্রয়ী]। ডিরোজিওর ভারতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলিকে বাদ দিলে তাঁর ব্যক্তিগত এবং সর্বমানবীয় পর্যায়ের কবিতাগুলিই সর্বোত্তম! ব্যক্তিগত কবিতার মধ্যে—'দি পোএট'স গ্রেভ' [১, ২] 'সিষ্টার-ইন-ল', 'হিআর'স এ হেলথ টু দী, ল্যাসি', 'টু মাই স্টুডেণ্টস অ্যাট হিন্দু কলেজ' প্রমুখ কবিতাগুলিকে অনন্যসাধারণ আখ্যা দিতে পারা যায়। সর্বমানবীয় কবিতা বলে যেগুলিকে অভিহিত করতে পারি, তাদের মধ্যে 'ফ্রীডম অফ দি স্লেভ', 'মর্নিং আফটার এ স্টর্ম', 'পোএট্রি অব হিউম্যান লাইফ' এই কবিতা তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঁচমিশেলী কবিতাগুলির মধ্যে 'ডন জুআনিকস', 'পোএট্রি', 'ওডস ফ্রম দি পার্সিআন অব হাফিজ', 'এ ওআক বাই মুনলাইট', 'সং অব আণ্টার: 'দি আরব', ইত্যাদির নাম করা চলে।

সংকলিত-অসংকলিত অজস্র কবিতার মধ্যে ডিরোজিওর এই রচনাগুলির উল্লেখ করা গেল, বিশিষ্ট উদাহরণ হিসেবে। এর বাইরেও তাঁর প্রচুর কবিতা ছড়িয়ে আছে,—কিন্তু কাব্যমূল্য বা অন্য দিক থেকে তাদের আলোচনাযোগ্যতা খুবই কম।

দুই.

ডিরোজিওর প্রধানতম কাব্যগ্রন্থ বলে পরিচিত 'দি ফকির অব জঙ্গীরা-র' গল্পাংশটি বেশ অভিনব : স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন দিয়ে 'সতী' হবার জন্যে শ্মশানভূমিতে নিয়ে আসা হয়েছে সদ্যোবিধবা তরুণী নলিনীকে। তার মনে দেখা দিয়েছে এক নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব : একদিকে সুতীব্র জীবনপিপাসা, অন্যদিকে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুনারীর যুগার্জিত ধর্মবোধের সর্বগ্রাসী সংস্কার। কুলবালার স্ত্রী-আচার-মূলক সঙ্গীত, বৈদিক ব্রাহ্মণদের স্তোত্রগান এবং জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে অবশেষে সংস্কারই প্রবলতর শক্তি হিসেবে প্রতিভাত হল ; সাজানো চিতায় উঠে বসে নলিনী সূর্যবন্দনা করতে শুরু করে। ঠিক সেই সময় নলিনীর পূর্ব-প্রণয়ী—এখন যে এক দস্যুদলের সর্দার, শ্মশানভূমিতে এসে হাজির হয় সদলে। প্রেয়সী নারীকে মৃত্যুর মুখোমুখি দেখে, দস্যুপতি তাকে তুলে নিয়ে যায় সাজানো চিতার উপর থেকে ; হারানো প্রণয়ীকে ফিরে পেয়ে নলিনীও অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে দস্যুদলের সঙ্গে তাদের ডেরা জঙ্গীরার পর্বতগুহায় হাজির হয়। এইখানে প্রথম সর্গের সমাপ্তি।

নলিনীর বিক্ষুব্ধ এবং অপমানিত পিতা, রাজমহলাধীশ সুজার কাছে এই 'অন্যায়ে'র প্রতিকার প্রার্থনা করলেন এবং তাঁর সহায়তায় সৈন্যবাহিনী নিয়ে দস্যুদের পাহাড়ে-ডেরায় হানা দিলেন। ওদিকে হারিয়ে-যাওয়া দিনকে আবার ফিরে পেয়ে নলিনী এবং দস্যুরাজ তখন পরম সুখে সময় কাটাচ্ছে। অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের প্রাক্কালে দস্যুসর্দার নলিনীকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, সে হানাদারদের পরাজিত করে ফিরে আসবে চিরদিনের মত দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে প্রিয়তমাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে। পরিণামে হানাদারেরা পরাজিত হল বটে, কিন্তু দস্যুপতির বাকি প্রতিশ্রুতিটুকু আর পূর্ণ হল না। যুদ্ধের অবশেষে পরদিন ভোরে দেখা গেল তার প্রাণহীন শরীরটাকে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে নলিনীর নিঃস্পন্দন তন্বীতনু। মৃত্যু এবার আর তাকে প্রিয়বঞ্চিত করতে পারে নি, বরং অন্তহীন মিলনের গ্রন্থিই সে বেঁধে দিল হয়ত বা।

এই কাহিনীর উৎস পাওয়া যায় বইয়ের শেষে ডিরোজিওর নিজের লেখা

টীকায় : "Although I once lived nearly three years in the vicinity of Jungheera, I had but one opportunity of seeing the beautiful, and truly romantic spot. I had a view of the rocks from the opposite bank of the river, which was broad & full, at the time I saw it, during the rainy season. It struck me then as a place where achievements in love & arms might take place ; and the double character I had heard from the Fakeer, together with some acquintance with the scenery, induced me to fund a tale upon both these circumstances."[৯] এই বক্তব্য থেকে কবিতাটির নামকরণের তাৎপর্যও বোঝা যায়।

আনুপূর্বিক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ইঙ্গ-বাঙ্গালী সাহিত্যের এই প্রথম উল্লেখযোগ্য আলেখ্য-কবিতাটি একটি অনুসন্ধানের স্বর্ণখনি-বিশেষ! প্রথমত, এই বইয়ের প্রারম্ভেই ডিরোজিওর সেই বিখ্যাত সনেট,

"My country ! in thy day of glory past
A beauteous halo, circled round thy brow...."[১০]

বিবৃত হয়েছে। এর আগের বছরে প্রকাশিত 'পোএমস'-এ ডিরোজিওর দেশ-মাতৃকার বন্দনাসমূহ 'হার্প অব ইণ্ডিআ' সনেটটির পর এই সনেটটিকেও এদেশের সাহিত্যে স্বদেশ বন্দনার ধারাপ্রবাহের প্রথম উৎসমুখ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। মনে রাখা দরকার যে, এই কবিতাটির পনের-ষোল বছর পরেও 'যশোর জেলার দত্ত বংশের সন্তান' মধুসূদন "I sigh for Albion's distant shore" বলে যেখানে কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, সেখানে এই 'ফিরিঙ্গি' [!] জন্মভূমিকে মাতৃভূমির সঙ্গে অভিন্ন করেই তার বন্দনা করেছেন! মনে রাখতে হবে যে, বাংলা সাহিত্যে তখনও ঈশ্বর গুপ্ত এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অনাগত। যাকে এদেশের প্রথম জাতীয় সংগীত বললেই যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হয়, সেই গানটি পর্যন্ত ডিরোজিওর এই কাব্যে ঝংকৃত হয়েছে :

"O ! lovely is my native land
with all its skies of cloudless light :
But there's a heart, and there's a hand
More dear to me than sky most bright.

I prize them—yes, as though they were
On earth the only things divine
The only good, the only fair—
And oh ! that heart and hand are thine.
My native land hath heavenliest bowers
Where Houris ruby-ckeeked might dwell,
And they are jemmed and with bud-flowers
Sweeter than lip or lute may tell'[১১]

'বন্দেমাতরম্' কিংবা 'সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি'র পূর্ব-প্রতিভাস-তুল্য এই দেশবন্দনা-সঙ্গীতের ভাষাটুকুই কেবল ইংরেজী বলে আমরা নিশ্চয় তাকে ব্রাত্য বলে গণ্য করব না !

স্বদেশচেতনার এই প্রকাশ আরো বিচিত্র সব বর্ণে চিত্রিত হয়েছে এই কাব্যের নিসর্গ বর্ণনায়। ভারতবর্ষের মৃদু উষ্ণ বাতাস, ঝর্ণার জলের ভাঙা-ভাঙা কুলুকুলু শব্দ, প্রখর সোনালি সূর্যালোক, গঙ্গার ঝিকিমিকি প্রবাহ, সবুজ মাঠে-বনে ঘাস-ফড়িংদের লাফালাফি, রঙ্‌বেরঙের ফুলে উজ্জ্বল প্রজাপতিদের ফুরফুরে ওড়াওড়ি, শাল-তাল-তমাল-বট-অশ্বত্থের ঠাণ্ডা ছায়ার পটভূমিতে তাঁর কাব্য সঙ্গীতময় হয়ে উঠেছে। গঙ্গার উপকূলে যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণদের বেদমন্ত্রপাঠ, কুলললনাদের ব্রতগান, ধর্মশীলার সূর্যবন্দনার সঙ্গে সঙ্গেই নবাবের দরবারের লক্ষদ্যুতিময়ী রূপ-বৈভব, মোগল এবং হিন্দুর সবীর্য অসি-ঝংকার, দস্যুনায়ক আর তন্বী নায়িকার দুঃসাহসিক রোম্যান্স—সব মিলিয়ে এই ছোট আখ্যানকাব্যটি এক বিচিত্র রসের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে বলতে পারি। এর মধ্যে স্কটের ব্যালাডীয় কাব্যের আভাস থাকতে পারে, থাকতে পারে ফরাসী ত্রুবাদুর কাব্যের প্রেরণা, প্রকৃতিতে-মানুষে অন্তর-সাযুজ্য একে ওআর্ডসওআর্থীয় গাম্ভীর্য দিয়েছে কখনো বা, হয়তো বলা সম্ভব নায়ক-নায়িকার মৃত্যুমিলন দৃশ্য রোমিও-জুলিএটের আদর্শান্বিত। এ সবই হয়তো ঠিক ; কিন্তু এই কাব্যের মূল ভাবস্পন্দনের আবর্তনে যে ভারতীয়তার ঐতিহ্যবোধ সক্রিয়, সেইটিই সব চেয়ে বড় কথা।

এই কাব্যের আর একটি বিশিষ্টতা হল, তদানীন্তন আমলে বহু বিতর্কিত সতীদাহ-প্রথার একটি নিখুঁত চিত্রায়ন। যদিও টীকায় ডিরোজিও বলেছেন : "I have taken a licence with the fact which thus assumes a more romantic character....."[১২]

কিন্তু সহমরণের পূর্বে চিতা-প্রদক্ষিণ, বেদমন্ত্রপাঠ, স্ত্রী-আচার, মুখাগ্নি, ভবিষ্যদ্বাণী প্রমুখ যাবৎ ধর্মানুষ্ঠানের এমনই পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি ডিরোজিও এঁকেছেন, যাতে তাঁর অভিনিবিষ্ট এবং পূর্ণায়ত একটি সামাজিক দৃষ্টির পরিচয় স্পষ্ট হয়। উল্লেখযোগ্য যে, এই কাব্য প্রকাশের পরের বছর সতীদাহ প্রথা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হলে. ডিরোজিও 'অন দি অ্যাবলিশন অব সতী' নামে অগ্নি এবং আবেগ-মিশ্রিত একটি কবিতা লেখেন। সে প্রসঙ্গ যথাকালে আলোচ্য। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ১৮২৮ সালে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করতে চেষ্টা করায় স্বয়ং রামমোহনের মত ক্ষমতা ও প্রভাবশালী লোকের নিরাপত্তা পর্যন্ত যেখানে বিঘ্নিত হয়েছিল রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতিদের. প্ররোচনায়. সেখানে আঠারো বছর বয়সী 'ফিরিঙ্গি' ইস্কুল মাস্টার হেনরী অকুতোভয়ে এমন এক কাব্য সৃষ্টি করছেন, যার উপজীব্য হল সহমরণোন্মুখ নারীকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে বিধর্মী প্রণয়ীর মিলন ঘটানো। এই দুঃসাহসই অধ্যাপক, সমাজ-সংস্কারক এবং কবি ডিরোজিওকে একত্র মিলিয়েছে।

প্রথম সর্গের সূর্যস্তোত্র এবং মন্ত্রপাঠের প্রসঙ্গ খুবই উল্লেখনীয়। ডিরোজিও 'ঋগ্বেদ' পড়েছিলেন এমন কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের হাতে নেই ঠিকই; কিন্তু এই কাব্যে যে সূর্যবর্ণনা এবং বন্দনা করা হয়েছে তার সঙ্গে ঋগ্বেদের সূর্যচেতনার এতটুকু পার্থক্য নেই বললেই চলে:

Hymn To The Sun

God of this beauteous world ! whom earth and heaven
Adore in concert and in concert love,
Whose praise is hymned by the eternal seven
Bright whirling minstrels of the court above.
God of this glorious universe !—the sea
Smiles in thy glance, and gladdens in thy ray,
And lifteth up its voice in praise to thee
Giver of good, creator of day.
God of th' immortal mind ! with power to scan
Though like diamonds in the cavern lie,
Though deeply bedded in the breast of man
Distinct and naked to thy piercing eye,

God of Eternity ! whose golden throne
Is borne upon the wings of angels bright ;
God of all goodness, thou art God alone,
Circled with glory, diademed with light.
Thou look'st from thy pavillion, and each cloud
Like fear o'ercome by hope triumphant flies :
The angry thunder's voice through raining cloud
As thy bright presence into silence dies.
When all is darkness, like the sad soul's night
And tempests lower like grief upon her hearts
Affrigated nature sees thy forehead bright
The black storm furls his banner and departs.
Thou mak'st the rainbow with thy golden beams,
Span the blue ocean rolling at thy feet
Set in the sky that arch of promise seems
Like hope still distant, and like hope still sweet.
The flowers, the beauty of the earth, implore,
Like woman in distress, thy rays so bring
Their beauty out of nothing, and their store
Of scent and sweetness ,from their latent spring
The forest's green is of thy giving. Thou
Dost fling its emerald mantle o'er the earth—
Postrate to thee let all creation bow
For all creation at thy word had birth.
O sun ! thy herald is the morning star
Like flame preceding greatness ; but when day
Comes on advancing with the glided car
Heaven's hosts of wonder melt like sparks a day.
Who shall declare thy glory ?—Unto thee
My heart in fervent adoration kneels

Thou know'st whate'er it sufferings may be
To thee alone it tremblingly appeals."[১৩]

অতঃপর প্রথম চার স্তবক পুনরাবর্তিত হয়েছে। এর সঙ্গে, এই কাব্যের অন্যত্রও যে সূর্যবর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলিও বিবেচ্য :

"Surya ! in thy course of light
Never saws't thou woman bright,
Like to her who soon shall be
Robed with immortality !
Hear thy servants' prayer from high
Regent of the sapphire sky."[১৪]

কিংবা

"The golden god of the day has driven
His chariot to the western gate
Of yonder red respledent heaven,
Where angels high to hail him wait.
But ere his couch he press to-night,
His mournful scene shall light."[১৫]

স্পষ্টতই ঋগ্বেদের আলোকদেবত্রয়ী—সূর্য, সবিতা এবং পূষণ ঐ স্তোত্র এবং এই সব বন্দনার মধ্যে প্রতিভাসিত হয়েছে অল্পবিস্তর। কথাটা বিশ্লেষণসাপেক্ষ :

ক. স্তোত্রের ১ম স্তবকে যেখানে 'চিরায়ত সপ্তকের' কথা বলা হচ্ছে, সেখানে তাদের বর্ণনা করা হয়েছে 'হুইলিং মিনস্ট্রেলস অব দি কোর্ট অ্যাবভ' বলে ; এই আবর্তমান সপ্তচারণকে ঋগ্বেদে বর্ণিত সূর্যের রথের সপ্তাশ্ব বলে মনে করা চলে।[১৬] স্মরণযোগ্য যে, হিন্দু পৌরাণিক চিন্তায় স্বর্গীয় চারণ অর্থাৎ কিন্নরদের রূপ হল অর্ধেক মানব, অর্ধেক অশ্ব ; এই কিন্নরদের কথাও এই কাব্যের অন্যত্র এবং টীকাংশে দেখা যায়।[১৭]

খ. ২য় স্তবকে যেখানে সূর্যের শুভকারী রূপের বর্ণনা আছে, তার সঙ্গেও ঋগ্বেদের সূর্য-চেতনার সাযুজ্য বিচার্য।[১৮]

গ. ৩য় স্তবকে সূর্যকে 'অবিনশ্বর মননের অধিদেব' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। উপনিষদে আত্মাকে ব্রহ্মচেতনায় মনরূপে 'হিরণ্যগর্ভ' বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, "সত্যের তত্ত্ব গুহায় নিহিত।" বেদের ভাষ্য

স্বরূপ এই ঔপনিষদিক-চিন্তার সঙ্গে 'থট দ্যাট লাইক ডাআমণ্ডস ইন দি ক্যাভার্ন লাঙ্গ' বর্ণনাটি তুলনীয়।[১৯]

ঘ. ৪র্থ স্তবকে স্বর্ণসিংহাসনারূঢ় সূর্য-মূর্তির সঙ্গে ঋগ্বেদের সবিত-মূর্তি তুলনীয়। স্তোত্র-বহির্ভূত ২য় উদ্ধৃতিটিও এ প্রসঙ্গে বিচার্য।[২০] এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সবিতা মূলত স্বর্ণবর্ণিম দেবতা। তাছাড়া তিনি অমরত্ব দানেরও অধিকারী। ৩য় স্তবকে সূর্যকে 'গড অফ ইমর্টাল মাইণ্ড' বলা হয়েছে, সেটা স্মর্তব্য।[২১]

ঙ. ৫ম স্তবকে বর্ণিত সূর্যের মেঘ-বজ্র-জয়ী রূপ, ৬ষ্ঠ স্তবকের অন্ধকার-বিজয়ী রূপ, ৭ম স্তবকের ইন্দ্রধনুস্রষ্টা রূপ, ৮ম স্তবকের পুষ্পগন্ধ এবং নারীর-মাধুর্য-প্রদাতা রূপ, ৯ম স্তবকের অরণ্যের-হরিৎবর্ণস্রষ্টা রূপ এ সবই ঋগ্বেদের বিভিন্ন মণ্ডলে ছড়ানো সূর্য, সবিতা, পূষণ প্রভৃতির উদ্দেশে নিবেদিত বিবিধ সূক্তের বর্ণিত রূপের অনুসারী।[২২]

চ. স্তোত্র বহির্ভূত ১ম উদ্ধৃতিতে সূর্যকে 'রিজেণ্ট অব দি স্যাফাআর স্কাই' বলা হয়েছে ; এটিও ঋগ্বেদ-নির্ভর বর্ণনা।[২৩]

স্পষ্টতই বেদ সম্পর্কে গভীর অনুধাবন না থাকলে ডিরোজিওর পক্ষে এত সব রূপকল্পকে আয়ত্ত করা সম্ভব হতো না ঃ আর বেদ সম্পর্কে তিনি যে অনবহিত ছিলেন না, তারও প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর এই কাব্যের স্বকৃত টীকাংশে ; "The Vedas, which are supposed to contain the essence of wisdom, declare in various places, wherever language of praise is employed the object of such praise is the Deity or Brihm. Thus fire is Brihm, the sun is Brihm, water is Brihm ; a number of other substances are defined in like manner. It is necssary to state that all prayers in the ceremony of female immolation are addressed to the sun."[২৪]

ঋগ্বেদের সুবিখ্যাত 'পুরুষ-সূক্ত'-এর[২৫] সঙ্গে এর মৌলিক বক্তব্যের মিলটুকু দ্রষ্টব্য। বৈদিক সাহিত্য সম্পর্কে ডিরোজিও এই অভিনিবেশ কি করে অর্জন করেছিলেন, সেটা চিন্তার বিষয়! ডিরোজিও মূল বেদ-উপনিষদ পড়েছিলেন এমন কথা প্রমাণ করা কঠিন। ডিরোজিওর আয়ত্ত-গম্য যে ভাষায় সেই সময়ে বেদচর্চায় নিদর্শন পাওয়া যায় তা কেবল উইলিআম জোন্স, আঁকিতেল দ্যুপের্,

কোলব্রুক এবং রামমোহনের লেখায়। পাশ্চাত্য-ভাষায় ভারততত্ত্ব-বিদ্যার প্রথম সাধক জোন্সের প্রথম বৈদিকতত্ত্ব সম্পৃক্ত গবেষণা হল 'অন দি গডস অব গ্রীস, ইতালী অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া' [১৭৮৪]। এই গবেষণায় সূর্যদেবতা সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা আছে। এছাড়া তিনি পরবর্তী আট-দশ বছরের মধ্যে বিভিন্ন বেদ এবং উপনিষদ থেকে কিছু কিছু অংশ তর্জমা করে প্রকাশ করেন এবং বৈদিক স্তোত্রের আদর্শে হিন্দু দেবদেবীদের উদ্দেশে কতকগুলি 'হিম্' বা স্তোত্র রচনা করেন। এই সব স্তোত্রগুলির মধ্যে একটি সূর্যদেবতার উদ্দেশে নিবেদিত হলেও, সেটির বক্তব্যে কিন্তু বৈদিক-বর্ণনা-অনুসারী নয়। সুতরাং সেটি ডিরোজিওর আদর্শও হতে পারে না।[২৬]

জোন্সের পর দ্যুপের্ঁ লাতিনে, কোলব্রুক ইংরেজীতে এবং রামমোহন ইংরেজী এবং বাংলা ভাষায় ফলিতভাবে বেদচর্চা করেন; ঊনবিংশ শতকের প্রথম তিন দশকের মধ্যে।[২৭] কিন্তু দ্যুপের্ঁর মতন রামমোহনের অভিনিবেশও মূলত সীমাবদ্ধ ছিল বিভিন্ন উপনিষদের বিশিষ্ট অংশসমূহের ভাষান্তরণে। এঁদের লেখা থেকে ডিরোজিও বেদের মূল তত্ত্ব সম্পর্কে জেনে থাকতে পারেন; কিন্তু তাঁর নিজের লেখায় প্রত্যক্ষ ভাবে বৈদিক্ রূপকল্প প্রয়োগের মূলটা অবশ্যই আরো গভীরে নিহিত।

এ ব্যাপারে বিভিন্ন সম্ভাব্য ব্যাখ্যার মধ্যে একটা হতে পারে যে, হিন্দু কলেজের তদানীন্তন কালের অন্যতম পরিচালক অধ্যাপক হোরেস হেম্যান উইলসনের কাছে এ বিষয়ে তাঁর পক্ষে বেশ কিছুটা সাহায্য পাওয়া সম্ভব। ডিরোজিওর এই কাব্য রচনার সময়েই যে পরবর্তীকালে বিখ্যাতএই ভারততত্ত্ববিদ ঋগ্বেদ গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের[২৮] প্রস্তুতি সুরু করেছিলেন, এমন ধারণা করা অসঙ্গত নয়। দুজনের মধ্যে সৌহার্দ্য, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং প্রীতিও ছিল সুগভীর। স্মরণযোগ্য যে, হিন্দু কলেজের পরিচালক মণ্ডলীর অধিকাংশ সভ্য ডিরোজিওকে যখন বিতাড়ন করার ব্যাপারে উদ্যোগী হন তখন ডেভিড হেয়ার এবং শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সঙ্গে উইলসনও প্রবল-ভাবে সেই অপপ্রয়াসে বাধা দেন। এখানে আরো একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য: ডিরোজিও এই কাব্যটি উৎসর্গ করেছেন উইলসনকেই। কে বলতে পারে, এটা তাঁর সেই স্নেহের ঋণ পরিশোধেরই প্রয়াস কি না! যে ড. গ্র্যাণ্টের কাছে তিনি আশৈশব স্নেহ এবং পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে এসেছেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকারের জন্যেই কিন্তু ডিরোজিও নিজের প্রথম বইটি তাঁকেই উৎসর্গ করেছিলেন!

দ্বিতীয় একটি ব্যাখ্যা সম্ভব, হয়তো কোনো সহমরণ অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হবার সুযোগ হয়েছিল ডিরোজিওর। ঐ অনুষ্ঠানের যে রকম পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রায়ন ডিরোজিও করেছেন, তাতে এ কথা বিশ্বাস করা চলে! সে ক্ষেত্রে ঘটনাস্থলে কোনো বেদজ্ঞ পুরোহিতের কাছে ঐ সব স্তোত্রের ব্যাখ্যা তিনি জেনে নিয়েছিলেন এমন কথা ভাবা যায়।

তৃতীয় একটি সম্ভাবনা হতে পারে যে, তাঁর কোনো ছাত্র বা বন্ধুস্থানীয় কারুর সাহায্য পেলেও পেয়ে থাকতে পারেন তিনি। তাঁর অ্যাকাডেমিক আসোসিয়েশনের অনেকেই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে ছিলেন। নিজেরা আচার-সংস্কার-ইত্যাদি ব্যাপারে বহুলাংশে মোহমুক্ত হলেও, অগ্রজতুল্য অধ্যাপকের প্রয়োজনে তাঁরা এ বিষয়ে কিছু সহায়তা করে থাকতে পারেন স্বাভাবিকভাবেই। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে ডিরোজিও শিষ্য কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি পরবর্তীকালে খৃষ্টান যাজক হওয়া সত্ত্বেও বৈদিক গবেষক হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[২৯]

এই কাব্য-রচনার ব্যাপারে ডিরোজিও যে তাঁর ছাত্রদের সাহায্য পেয়েছিলেন এমন স্বীকৃতি তিনি নিজেই দিয়েছেন বইয়ের টীকাংশে : "A student of that excellent institution, the Hindu College, once brought me a translation of the Betal Puncheesa, and following fragment of tale having struck me for its wilderness. I thought of writing a ballad." [৩০]

ডিরোজিওর কাব্যে বৈদিক রূপকল্প প্রয়োগের উৎস হিসেবে মোটামুটিভাবে এর সবকটি ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য। এমন কি, এই সব কটি সম্ভাবনাকে একত্রেও বিচার করা যেতে পারে : বরং সেটাই হয়ত বেশি যুক্তিসম্মত হবে।

তিন.

মহানগরী কলকাতার আদি প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্ণক নাকি সহমরণে প্রেরিত কোনো এক তরুণী ব্রাহ্মণ-কন্যাকে উদ্ধার করে তাঁর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। বলতে পারি যে, পত্তনকালেই কলকাতার আদি-দম্পতীর মাধ্যমে এইভাবে এদেশে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার মেলবন্ধনের সূত্রপাত হয়েছিল। ঐ মেলবন্ধনই এ দেশে প্রগতিরও সূত্রস্বরূপ। প্রচলিত এই কাহিনীর সমন্বয়ের প্রেরণা ডিরোজিওকে কিছুটা প্রবুদ্ধ করে থাকতে পারে! কিন্তু, এই কাহিনীতে যে প্রগতিমূলক সমন্বয় চিত্রিত হয়েছে তার গুরুত্ব অন্য রকম: সে সমন্বয় হিন্দু ও মুসলমানের।

'দি ফকির অব জঙ্গীরা'র নায়িকা হিন্দুকন্যা; নায়কের নাম আমাদের অজানা হলেও তার ধর্ম সম্পর্কে আমরা সুনিশ্চিত হতে পারি তার নিজেরই কথায়:

> "No more to Mecca's hallowed shrine
> Shall wafted be a prayer of mine
> Henceforth I turn my willing knee
> From Alla, Prophet, heaven, to thee...."৩১

স্পষ্টতই, নায়ক মুসলিম ধর্মাবলম্বী।

তা হলে মূল ঘটনাটা এই যে, উচ্চবর্ণীয়া হিন্দুকন্যা প্রথম যৌবনে কোনো তরুণ মুসলমানকে ভালবেসেছিল; ঘটনাক্রমে, ধর্মসংস্কারকে বিসর্জন দিয়ে সে প্রণয়ীর সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ অর্জন করে ধন্য হল; অন্যপক্ষে, প্রণয়িনীর জন্যে মুসলমান নায়ক মক্কা-আল্লা-পয়গম্বর-এবং-বেহেস্তের প্রতিও আনুগত্য বর্জনে প্রস্তুত। ধর্মবোধের চেয়ে জীবনবোধকে বড় করে দেখানোর মধ্যেই এই কাব্যের মহত্তম প্রগতিশীলতা।

শুধু এই নয়, আরো দেখছি যে 'মুসলিম দস্যু' কর্তৃক 'অপহৃতা হিন্দু'কন্যার উদ্ধারের জন্য মুসলমান নরপতি এক হাজার সৈন্য পাঠাচ্ছেন; ধর্ম-সংস্কারের পরিবর্তে সামাজিক নীতি-সংস্কারকে প্রাধান্য দেওয়ার পরিচয়বাহী এই ঘটনার মধ্যেও ঐ এই একই দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হচ্ছে না-কি?

উল্লেখযোগ্য যে পরবর্তীকালে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ঐ ধরণের সমন্বয়ের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' [১৮৫৮]-এ শিবাজী-রোশিনারার কাহিনী,' 'দুর্গেশনন্দিনী' [১৮৬৫]-তে আয়েষা-জগৎসিংহের প্রণয়, 'রাজসিংহ' [১৮৯১]-এ ঔরঙ্গজীব-নির্মলকুমারীর ভালোবাসা, 'অশ্রুমতী' [১৮৭৯]-তে সেলিম-অশ্রুর প্রেম এ সবই প্রসঙ্গক্রমে স্মর্তব্য। 'সতী' [১৮৯৭] কাব্যনাট্যটি ত বিশেষভাবে স্মর্তব্য; তার মূল প্লটের কাঠামো রবীন্দ্রনাথের এবং এই কাব্যের কাঠামোর ছক দুটি মোটামুটিভাবে একই। সেখানেও বিধর্মীর সঙ্গে কন্যা অমাবাঈ-এর মিলনে বিক্ষুব্ধ পিতা 'জামাতার' বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং পরিণতিতে তারও মৃত্যু ঘটে। বিধবা অমাও প্রাণ বিসর্জন দেয়। কিন্তু বাংলা দেশে সেই উগ্র ধর্মান্ধতার যুগে এই সমন্বয়ের প্রেরণা ডিরোজিও পেলেন কোথায়? আসল কথা যে ধর্মসংস্কারবিমুক্ত মানবতাবোধ ডিরোজিওকে পরবর্তী সময়ে নাস্তিকরূপে পরিচিত করেছে সেই বিশ্বাসেরই কাব্যিক প্রকাশ এটি। বাংলা দেশের পূর্ববঙ্গের গীতিকা-সাহিত্যে যে ধর্মগত অন্ধতা-বর্জিত সমন্বয়বোধের আত্মপ্রকাশ দেখি, সেই মনের আধুনিক সংবেদনই যে হল এই কাব্য, এমন বললে অন্যায় হবে না।

শুধু মর্জিতেই নয়, প্রকরণে এবং রূপারোপণেও এই কাব্যের মধ্যে গীতিকার উপাদান রয়েছে। মধ্যযুগীয় পরিবেশ, ভয়ংকর ধর্মানুষ্ঠানের বর্ণনা, দস্যুসর্দার কর্তৃক এক পুরানো প্রণয়িনীকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া, উদ্দাম প্রণয়চিত্র, প্রবল যুদ্ধ এবং যুদ্ধান্তে নায়ক-নায়িকার রোমান্টিক মৃত্যু, ব্যালাডের পক্ষে এ ত আদর্শ প্লট! অন্যপক্ষে ব্যালাডের যা ফর্মগত বৈশিষ্ট্য, যেমন রিফ্রেন বা ধুয়া, তার উদাহরণও এর মধ্যে মেলে। 'দস্যুদলের গানের মধ্যে:'

"Towards yon grey isle the waters flow.
Then brothers, bravely row...."[৩২] ইত্যাদি।

কিংবা, 'মহিলাদের কোরাসের':

"On to the alter, and scatter the flower"[৩৩]

ইত্যাদি অংশ এ-প্রসঙ্গে বিচার্য।

প্রকৃতপক্ষে এ কাব্য হল একটি মিশ্র-প্রবণতার সমষ্টি। কখনো এর মধ্যে বৈদিক স্তোত্রের অনুরণন একে ধ্রুপদী প্রবীণতা দান করেছে, কখনো ব্যালাডীয় শৌর্য-বীর্য-প্রণয় একে মধ্যযুগসুলভ রোমান্টিকতায় ভূষিত করছে,

কখনো আবার সংস্কার-হীনতায়, সমন্বয়-চিন্তায় এবং মানবতাবাদী আত্মস্বাতন্ত্র্যের ঘোষণায় এর মধ্যে আধুনিকতা প্রমূর্ত।

এই শেষ ভাবধারারই কিছুটা উত্তরসরণ দেখি পরবর্তীকালে মাইকেল মধুসূদনের লেখাতে। অবশ্য ডিরোজিওর যথার্থ উত্তরসূরী মধুসূদন কি-না, সে নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছেই; সেই প্রসঙ্গে এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে আলোচনাও করা হয়েছে। তবে এই কাব্যে অন্তত একটি বর্ণনা পাই, যার সমান্তরাল চিত্র 'মেঘনাদবধ কাব্যে' [১৮৬১] হাজির হয়েছে! সুজার দরবারের বর্ণনা এবং রাবণের রাজসভার বর্ণনার ঐ তুলনায় আমরা দেখি:

ক. "The lamps upon each marble wall
Now echoing with the sound of song,
Those lamps are of glittering gold
Like sunset gleaning o'er the sea
And scented is the store they hold
As at some blest Immortal's call····
···· ···· ····
On carpet bright of velvet green
Whose broidered rim with gold is shining
With pearls the glittering lines between
The prince is all at ease reclining.
And golden cups & goblets bright
With spices sweet from Lunka's isle
And sherbets all like liquid light
Sparkle around him there the white.
And crystal vases gemmed with gold,
Meet ornaments for heavenly bowers
In fragrant heaps and clusters hold
The most enchanting fairly flowers." ৩৪

খ. "ভূতলে অতুল সভা স্ফটিকে গঠিত,
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস-সরসে
সরল কমলকুল বিকশিত যথা।

শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি
বিস্তারী অযুত ফণা ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা ; যথা ঝোলে
[খচিত মুকুলে ফুলে] পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভাসমমুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা ঝলসি নয়নে"[৩৫]

সামগ্রিকভাবে 'দি ফকির অব জঙ্গীরা' কাব্যে ইউরোপীয় আদর্শের অনুসরণ দেখা না গেলেও এর কিছু কিছু অংশে তার আভাস যে মেলে না এমন নয়। সেকালীন ইংরাজী কাব্যে বহুজনপ্রিয় স্কটের অনুপ্রেরণা এই কথাকাব্য রচনার পিছনে সুপ্ত উৎসাহ হিসেবে থাকতে পারে। ২য় সর্গের ১০ম থেকে ১৮শ স্তবকমালায় মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে আন্তরিকতার ফলে যে বিশেষ আবহ সৃষ্টি হয়েছে, তাকে ওআর্ডসওআর্থীয় বলতে পারি ; [কিন্তু 'বেদজ্ঞ' ডিরোজিও অন্ততপক্ষে জোন্সের অনূদিত 'শকুন্তলা' (১৭৮৯) পড়েন নি কি ?] নলিনী এবং দস্যুপতির প্রণয়ের পটভূমি হিসেবে যখন প্রকৃতির রূপ বর্ণিত হচ্ছে, তখন সে আনন্দোচ্ছল, সৌন্দর্যময়ী ; চন্দ্রালোকে বহমান ঝর্ণার সঙ্গে প্রণয়ীযুগলের খুশির প্রবাহও তখন সমান্তরাল ভাবে বহে যাচ্ছে এবং

"Hope's and the moon's rays quiver o'er them still."[৩৬]

আবার নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদের মুহূর্তে প্রকৃতির মধ্যে তাদেরই বেদনা প্রতিধ্বনিত : "Lost is the light of the last remaining ray"[৩৭] শেকসপীআর-পাঠকের কাছে এ জিনিষ একটুও অচেনা লাগে না। আবার শেষ দৃশ্যে প্রণয়ীযুগলের আলিঙ্গনাবদ্ধ মৃতদেহ দুটি পরদিন গ্রামবাসীরা যখন আবিষ্কার করল, তখনকার সেই চিত্রায়ণের মধ্যে নিঃসন্দেহে 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিএট'-এর অনুপ্রেরণা আছে। উল্লেখ করা যায় যে, এই কাব্য রচনার প্রায় একই সময়ে ডিরোজিও 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিএট' নামে একটি সনেটও রচনা করেছিলেন [এপ্রিল ১৮২৭]।

ডিরোজিওর এই কাব্যের একটি উপ-আখ্যান রয়েছে : বেদচর্চায় তাঁর ছাত্রদের কাছ থেকে সম্ভাব্য সহায়তালাভের প্রসঙ্গ আলোচনার সময়ে সেটির উল্লেখ করা হয়েছে আগে। এই কাহিনীটির প্রসঙ্গ দুটি কারণে দরকার :

প্রথম, ডিরোজিও তাঁর গ্রন্থের টীকা-অংশে, তাঁর 'অজ্ঞাত পরিচয়' ছাত্রের সংগৃহীত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র একটি গল্প সন্নিবিষ্ট করেছেন ; এটিকেই ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্যে এ অবধি প্রথম-পাওয়া গল্প হিসাবে গণ্য করা চলে। এই অনুবাদটি সম্ভবত ১৮১৭ সালে প্রকাশিত জনৈক ছিদামচন্দ্র দাসের অনুবাদ-করা ইংরাজী 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র অংশবিশেষ। দ্বিতীয়ত, লোক-সংস্কৃতির প্রতি যে ঐতিহ্যবোধ থাকলে একজন লেখককে যথা অর্থে 'জাতীয় কবি বলে গণ্য করা যায়, সেই ঐতিহ্যের সার্থক অভিব্যক্তি ঘটেছে এই লোকবৃত্ত-নির্ভর কাহিনীটি অবলম্বন করাতেই।

২য় সর্গে সুজার দরবারের বর্ণনাকালে, এক কথকের মুখে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'-আশ্রয়ী ঐ উপকাহিনীটি বলা হয়েছে। কাহিনীটি সারাংশ হল এই : প্রণয়িনী রাধিকার মৃতদেহ নিয়ে রাজপুত যুবক যোগেন্দ্র শ্মশানভূমিতে তান্ত্রিক সাধনায় নিরত, উদ্দেশ্য প্রেয়সীর পুনর্জীবন অর্জন। এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী এসে তাঁকে ঐ সাধনায় সিদ্ধিলাভের পথে সম্ভাব্য ভয়াবহ সব বিঘ্নের কথা শোনালেন, যার সামনে সাহসে অবিচল থাকলে, তবেই ফললাভ হবে। সন্ন্যাসীর বর্ণনা মতোই, পরপর তিন রাত্রি প্রেতিনীরা এসে যোগীন্দ্রকে গান গেয়ে ভয় দেখায় এবং অন্যভাবেও প্রলুব্ধ করে ; কিন্তু যোগীন্দ্র অবিচল থেকে পরিণামে সফল হন।

প্রেতিনীদের মুখের ঐ গানটিও বিশেষ উল্লেখ্য :

"O! now do not leave me
Since false friends have flown
Dear love! do not grieve me
I' ve thought thee mine own...." ৩৮

সমকালীন বাঙালী সমাজে প্রচলিত নিধুবাবু প্রমুখের লৌকিক টপ্পা ইত্যাদি গানের প্রতিধ্বনিই কি পাওয়া যাচ্ছে না এর ভাবে এবং ভাষায় ?

চার·

'দি ফকির অব জঙ্গীরা' ছাড়া ডিরোজিওর আরো একটি আখ্যানকাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে: 'দি এনচ্যাণ্ট্রেস অব দি কেভ'। এ ছাড়া 'এ ড্রামাটিক স্কেচ' নামে একটি দ্বৈতচরিত্র-নির্ভর নাট্যকাব্যও তিনি লিখেছিলেন। এদের মধ্যে প্রথমটি কাল্পনিক হলেও, ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় ইতিহাসের পটভূমিতে লেখা। সংক্ষেপে এর আখ্যানাংশ হল:

ভারতবর্ষের আধিপত্য নিয়ে হিন্দু ও মুসলিম বাহিনীর মধ্যে চূড়ান্ত সংগ্রামের আগের রাত্রে মুসলিম সেনাপতি নাজিম গেছেন যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি একটি পর্বতের গুহাবাসিনী জনৈকা যাদুকরীর কাছে ভাগ্য গণনা করাতে। সহধর্মিণী জুমলীর কুশল-চিন্তায় তিনি উদ্বিগ্ন। ঠিক এই সময় নাজিম দেখলেন যে, যুদ্ধে আসার পথে হঠাৎ-জুটে-যাওয়া তাঁর বালক সহচর নিখোঁজ হয়েছে। অতঃপর যাদুকরীর কাছে নানা প্রশ্নের হেঁয়ালিভরা এবং এড়িয়ে-এড়িয়ে-যাওয়া উত্তর পেয়ে বিমূঢ় হয়ে শিবিরে ফেরার মুখে নাজিম সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন যে, ঐ ডাকিনী আর কেউ না, ছদ্মবেশী জুমলী স্বয়ং! বালক-সহচরের ছদ্মবেশে তিনি বরাবরই স্বামীর সঙ্গে ছায়ার মতন থেকেছেন।

প্লটটি নিঃসন্দেহে রোমান্টিক। 'জঙ্গীরা'র বিয়োগান্ত প্রেমের বদলে এর মিলনান্তে রোমান্স ভিন্নতার স্বাদ বহন করে। শেকসপীআরীয় কৌশল 'সেক্স কনসীলমেণ্ট' এখানে চমৎকার কাব্যিক ভঙ্গীতে নিবেদিত হয়েছে। মূলত কথোপকথনের মাধ্যমে পরিবেশিত এই আখ্যানটিকে এক অর্থে নাট্যকাব্য হিসাবেও গণ্য করা চলে। প্রাসঙ্গিক বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহে' [১৮৯১] ছদ্মবেশে দরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়াটা হয়ত বা জুমলীর আদর্শেই সৃষ্টি হয়েছিল!

এই কাব্যের ভাষা এবং চিত্রকল্প নির্বাচনের ব্যাপারে ডিরোজিও একটি বিশেষ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। সম্পূর্ণ মুসলিম চরিত্রের সমাহারে এই আখ্যায়িকা রচনার সময়ে, একজন সতর্ক শিল্পীর মতোই তিনি মুসলমানী-শব্দ, মুসলিম-পুরাকাহিনী-অবলম্বী রূপকল্প এবং মুসলিম-রীতিনীতির সুনিপুণ বর্ণনা করেছেন প্রয়োজনমাফিক। মূল কবিতার প্রথম চরণেই ডিরোজিও লিখেছেন:

ক. "Bright shone Mehtab on many a hill"[৩৯]

অতঃপর, নিজেই 'মেহতাব' শব্দের অর্থে লিখে দিয়েছেন টীকা হিসাবে, 'দি মুন'। স্পষ্টতই, মুসলিম আমেজ আনবার জন্যেই ডিরোজিও 'মেহতাব' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, নইলে 'দি মুন' লিখলেও ছন্দোস্পন্দন অক্ষুণ্ণ থাকত।

খ. "And on his blade the Koran verse

Bespeaks for very foe are a curse"[৪০]

মধ্যযুগের মুসলিম যোদ্ধাপুরুষদের পালিত এই রীতি উল্লেখ নিঃসন্দেহে কবির সচেতন দৃষ্টি পরিচায়ক।

গ. প্রচুরায়তভাবে মুসলিম শব্দ ব্যবহৃত হয়ে এক বিশেষ আবহ সৃষ্টি করেছে এই কাব্যে ; যেমন—'কাফির,' 'আফ্রিং,' 'ইজরাফিল,' 'এবলিস' ইত্যাদি।[৪১]

ঘ. মুসলিম ধর্ম এবং ইতিহাস-সম্পর্কে ডিরোজিওর গভীর জ্ঞান প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতার শেষে তাঁর নিজের করা ছ-টি টীকায়। 'ছুহল মিনার,' 'জামসেদের রত্ন,' 'সোলেমান জারেদের পাঞ্জা,' 'সুখরৎ পাথর' ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁর সন্ধিৎসা দেখবার মতন।[৪২] 'জঙ্গীরা'র মতন এই কাব্যের টীকাংশেও তাঁর বিচিত্র এবং অভিনিবিষ্ট অধ্যায়ননিষ্ঠা জাজ্বল্যমান।

'এ ড্রামাটিক স্কেচ' নাট্যকবিতাটির পটভূমি পশ্চিম হিমালয়ের কোনো এক দুর্গম নির্জন গুহা। দূরে একটি নদী, কাল প্রদোষ। আলোক এবং ঈশ্বরের বন্দনা সাঙ্গ করে ঋষি তাঁর শিষ্যকে—যে না-কি 'পুণ্যনগরী' রোমের সন্তান[৪৩] —শোনান এক ব্রহ্মের মাহাত্ম্য এবং ঐহিক বিশ্বের ওপারের দিব্যজীবনের মহৎ বার্তা। জীবনপ্রেমিক শিষ্য চায় মানুষের মধ্যে থেকে সাধনা করতে ; সমাজ ও মানুষের সম্বন্ধের মধ্যেই তার মতে সাধনার ভূমা। ক্ষুব্ধ ঋষি তিরস্কার করেন তাকে, প্রত্যুত্তরে সে তাঁকে এক অনবদ্যাঙ্গীর রূপ বর্ণনা করে শোনায়। প্রেমের মধ্যেই সে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে প্রয়াসী। জীবন বিমুখ ঋষি শিষ্যকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন…সংক্ষেপে এই হল এই নাট্যকাব্যের উপজীব্য। স্পষ্টতই, 'জীবনের কবি' ডিরোজিওর সহানুভূতি জীবনপ্রেমিক শিষ্যের দিকে। তাঁর মননের ঐ বিশেষ দিকটিই এ কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতীয় পর্যায়ের অন্যান্য কবিতার মধ্যে 'রুইনস অব রাজমহল' উল্লেখযোগ্য। কবিতাটি লেখা সমসাময়িক ভারতপ্রবাসী ইংরেজ কবি হেনরী মেরেডিথ পার্কারের 'রুইনস অব ব্যাবিলন'এর আদর্শে।[৪৪] নবাবী আমলের

এককালীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ কবির মনে যে বিষণ্ণ অতীতচারণার সৃষ্টি করেছিল, রাজমহল থেকে বিদায়কালে তার স্মৃতিটুকুই তিনি এই কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। এর মধ্যে 'এনচ্যানণ্টেস'-এর মতোই স্বাভাবিক মুসলিম 'আবহ' বজায় আছে।

অতীত স্মৃতির প্রতি নস্টালজিক হয়েও দেশপ্রেমের অগ্নিঅক্ষরে পরম আশাবাদী একটি সনেট লিখেছিলেন ডিরোজিও, 'দি হার্প অফ ইণ্ডিআ'—যেটি 'জঙ্গীরা'-র বহু-আলোচিত সনেটটিরই অনুরূপ। মূরের 'দি হার্প অফ এরিন' কবিতার অনুপ্রেরণায় লেখা হলেও, এর জলন্ত দেশপ্রেম ডিরোজিও-পরবর্তী বাংলাদেশে সচেতন আত্মবোধের এক প্রস্তুতিকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। কবিতার শেষ চরণে তিনি যে প্রার্থনা করেছেন "Harp my country! let me strike the strain!"—সে প্রার্থনা সফল হয়েছে। মাতৃভূমির বীণার তারে তাঁরই প্রদত্ত প্রথম ঝংকার এদেশে নবযুগের সূচনা করেছে।

'ভারতীয়'-পর্যায়ে ডিরোজিওর বিশিষ্ট কাব্য হল 'অন দি অ্যাবলিশন অব সতী'। ১৮২৯ সালে বড়লাট বেন্টিংক আইন করে সতীদাহ প্রথা রদ করে দিলে রামমোহনের আন্দোলন সার্থক হল। 'জঙ্গীরা' কাব্যে এই ঘৃণ্য প্রথা সম্পর্কে ডিরোজিওর তীব্র একটি মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল এর আগেই।[৪৫] এই কবিতাটির তীব্রতা আরও জলন্ত এবং গাঢ়। কাব্যগুণে, রূপকল্পের অসাধারণত্বে এবং সর্বোপরি বক্তব্যের সঙ্গে ছন্দোস্পন্দের সুষম বিন্যাসে এটি একটি অতুলনীয় সৃষ্টি।

কবিতাটি শুরু হচ্ছে এইভাবে:

> "Red from his chambers came the morning sun
> And frowned, dark Ganges on thy fatal shore
> Joruneying on high ; but when the day was done
> He set in smiles, to raise in blood no more,
> Hark ! heard ye not ? The widow's wail is over...."

অতঃপর ডিরোজিওর ঘৃণ্য পুরোহিততন্ত্রের কুৎসিত চেহারাটা বর্ণনা করেছেন:

> "The priestly tyrant's cruel charm is broken
> And to his den alarmed the monster creeps...."

সামান্য অথচ সংহত বাগভঙ্গীতে ডিরোজিও তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন! অতঃপর বেন্টিংক সম্পর্কে শ্রদ্ধাঞ্জলি:

"Bentinck ! be thine the everlasting mead !"

ইত্যাদি। তারপরে তাঁর উদ্দেশে আরো নিবিড় শ্রদ্ধানিবেদন :

"He is the friend of the man who breaks the seal
The despot custom sets in dead and thought,
He labours generously for human weal
Who holds omnipotence of fear as nought...."

ডিরোজিওর উদ্দিষ্ট 'মানববন্ধু' কি রামমোহনই ? নাম না করলেন না কেন ?

পরবর্তী কয়েক স্তবকে বিপ্লবের বিজয়বার্তা ঘোষণা করে ডিরোজিও শেষ স্তবকে এসে বলেছেন : ঝড় গতমান, ইন্দ্রধনু আদিগন্ত বিস্তৃত ; অন্ধকারের মসীরথ বিদায়ের পথে সঞ্চরণশীল ; মৃদু বাতাস আদর করছে উদার শিশুকে এবং

"Morning's Hearld star
Comes trembling into day : O ! can the sun be far ?
INDIA."

কবিতার সমাপ্তিতে মাতৃভূমির নামটুকু লেখা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

ভারতীয় পর্যায়ের অন্য সব কবিতার মধ্যে 'ডেভিড হেআর'[৪৬] সনেটটি ও 'সং অব দি ইণ্ডিয়ান গার্ল,'[৪৭] 'সং অব দি হিন্দুস্তানী মিনস্ট্রেল' ইত্যাদি কবিতা উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে ডেভিড হেআরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনটির অনুপ্রেরণা কিছু পরিমাণে তাঁর ব্যক্তিগত বলেও মনে হয়।

পাঁচ.

অতঃপর ডিরোজিওর 'ইউরোপীয়'-পর্যায়ের কবিতাগুলি আলোচ্য। এই বিভাগে সবচেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর 'গ্রীক' কবিতাগুলি। মাতৃভূমির পরেই যে দেশকে ডিরোজিও সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন—সে হল গ্রীস। এই ভালোবাসা তার শৌর্য-বীর্য এবং সুমহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য। ডিরোজিওর দুর্ভাগ্য যে তাঁর আমলে ভারতীয় শৌর্যের ইতিহাসমালা লিখিত হয়নি ; মিলের ইতিহাস[৪৮] [১৮২৪] কিংবা তারও পূর্ববর্তী ডাওয়ের ইতিহাসে[৪৯] [১৭৬৪-৭২] বা মার্চেন্টের সমসাময়িক ইতিহাস[৫০] [১৭৭২] ইত্যাদি বই ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাসকে বিবৃত না করে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থই সাধিত করেছে মাত্র। পরবর্তীকালে এদেশে যা ঐতিহাসিক সাহিত্যের আকরগ্রন্থ হিসেবে গণ্য হয়েছিল, টডের সেই 'রাজস্থান'[৫১] [১৮২৯-৩০] গ্রন্থ ডিরোজিওর জীবনকালে প্রকাশিত হলেও তিনি রাজপুত ইতিহাস নিয়ে কাব্য রচনায় প্রবুদ্ধ হননি কেন জানি না !

ডিরোজিওর দেশপ্রেম যে উৎসমুখ থেকে প্রবহমান, তাঁর গ্রীস-প্রীতিও সেই উৎসেরই ক্ষীণতোয়া পূর্বপ্রবাহ। হিন্দু কলেজে পরবর্তীকালে গ্রীসের ইতিহাস এবং মহাকাব্য দুটি পড়িয়েছেন তিনি[৫২] কিন্তু তার আগে, কাব্যচর্চার প্রথম আমলেই তিনি গ্রীক-ইতিহাসের দেশপ্রেমাত্মক কাহিনীগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। 'থার্মপলি,' 'গ্রীকস অ্যাট ম্যারাথন,' 'অ্যাড্রেস টু দি গ্রীকস,' 'দি গ্রীসিআন সাআর অ্যাণ্ড সন,' 'গ্রীস' এইসব কবিতাগুলিই ঐ একই ভাবনায় সংহত। 'থার্মপলি' কবিতায় শহীদ দেশপ্রেমিকদের উদ্দেশে ডিরোজিও শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন :

> "Let them rest—nought could appeal
> Those who armed at Honour's call :
> Feel they not as heroes fall—
> For Liberty ?"

লক্ষণীয়, 'অনার' এবং 'লিবার্টি' শব্দ দুটিকে ডিরোজিও বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে চিহ্নিত করেছেন। বলতে পারি, এই শব্দ দুটিই ছিল তাঁর জীবনের বীজমন্ত্র ! অধ্যয়নে, অধ্যাপনায়, সমাজ-চিন্তায়, কাব্যে—সর্বত্রই এ শব্দদুটি তার মৌলিক জীবনপ্রেরণা !

গ্রীক সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর আনুরক্তির নিদর্শন মেলে মার্ন্টীয় কাহিনী অবলম্বনে লেখা 'দি ব্রাইডাল' কবিতাটিতে— যার সঙ্গে ভারতীয় পুরাণের সুন্দ-উপসুন্দ কাহিনীর মিলটি আশ্চর্য রকমের— আর মহিলা কবি সাফোর উদ্দেশে নিবেদিত সনেটটির মধ্যে। উল্লেখযোগ্য যে, গ্রীক-সংস্কৃতি থেকে আমাদের নেওয়া ঋণের বিশ্লেষণ করে ডিরোজিও একটি ছোট্ট নিবন্ধিকাও[৫৩] লিখেছিলেন, যা সাময়িক পত্রের পাতায় পরবর্তী সময়ে খুঁজে পেয়েছি আমরা। শুধু এই নয়, গ্রীসের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা-ভক্তির সার্থকতম অভিব্যক্তি দেখতে পাই 'দি পোএট'স হ্যাবিটেশন' কবিতায়—যেখানে কবি ঈজীয় সাগরের কোনো একটি দ্বীপের মধ্যে উধাও হতে উৎসুক।[৫৪]

ফরাসী-ইতিহাস-নির্ভর দুটি কবিতার মধ্যেও ডিরোজিও 'অনার' এবং 'লিবার্টি'র জয়গান শুনিয়েছেন। 'অল ইজ লস্ট সেভ অনার' কবিতাটির নাম করণেই এ কথার যাথার্থ্য সুপ্রতিষ্ঠ; আর 'এনকডোট অব ফ্রান্সিস ওআন' কবিতায় মুক্তির বন্দনা করেছেন ডিরোজিও। স্পেনের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ফরাসী সম্রাট মাতৃভূমিতে প্রবেশ করতে চলেছেন:

"Now broken was his chain ;
What were his feelings when he cried
'I am a king again."

স্বাধীনতা যে মানুষের মহত্তম অধিকার—এই কথা তার সর্বমানবীয় পর্যায়ের বিভিন্ন কবিতাতেই ব্যক্ত হয়েছে। 'ফ্রীডম অব দি স্লেভ' কবিতা এবং এই 'এনকডোট' রূপকল্পে পর্যন্ত তুলনীয়। সম্রাট থেকে ক্রীতদাস অবধি মুক্তির অনুভব যে সবার কাছেই সমান মহান—এই সাম্যবোধ ফরাসী-বিপ্লব-উত্তরকালের একজন যথার্থ প্রগতিবাদীর কাছে পাওয়াটা অবশ্য বিস্ময়কর নয়!

ইতালীয় কবিতাগুলি মূলত রোমান্টিক। তাঁর 'ইতালীয়া' সনেটটিকে মধুসূদনের বিখ্যাত চতুর্দশী "ইতালী বিখ্যাত দেশ কাব্যের কানন"[৫৫] কবিতার পূর্বধ্বনি মনে করতে পারি। ডিরোজিও এবং মধুসূদন দুজনেই অবশ্য ইতালীকে দেখেছেন "দি ল্যাণ্ড অব দি লাভার অ্যাণ্ড দি পোএট"[৫৬] হিসেবে। 'তাসো' কবিতাটিও প্রসঙ্গত স্মর্তব্য।

পর্তুগীজ সুরে তিনি মাত্র দুটি গান লিখেছিলেন—যা তাঁর কাব্যের কোনো সংস্করণেই সংকলিত হয় নি। পদবীর ঋণ শোধ করা ছাড়া আর কোনো মূল্য স্বয়ং ডিরোজিওই এদের দিতে চান নি।[৫৭] এগুলিকে তিনি কাব্য সংকলনে ঠাঁই দেননি নিজেই।

'জঙ্গীরা' এবং 'এনচ্যাণ্ট্রেস' কাব্যদুটিতে ব্যবহৃত শেকসপীআরীয় রীতির উল্লেখ করা হয়েছে এর আগে। তাঁর শেকসপীআরীয় সনেট দুটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক শেকসপীআর-সমালোচনায় যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিভাসিত হয়েছে, শেকসপীআরীয় চরিত্র এবং কাহিনী সংস্থানের ব্যাখ্যানমূলক মৌলিক সাহিত্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে—দেড়-শ বছর আগেই এদেশের একজন তরুণ অধ্যাপক তার উপাদান সৃষ্টি করে গেছেন, এটা যথেষ্টই বিস্ময়কর!

এই পর্যায়ের সনেট দুটির মধ্যে 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিএট' কবির নিজের জবানীতে লেখা এবং 'য়োরিক'স স্কালে'র জবানী সম্ভবত স্বয়ং হ্যামলেটের মুখেই বসানো হয়েছে। প্রথম সনেটটিতে প্রেম এবং দ্বিতীয়টিতে মৃত্যু সম্পর্কে ডিরোজিও তাঁর চেতনার সারটুকু নির্যাসিত করেছেন। 'লাভ'স ফার্ষ্ট ফীলিংস;' 'দি গোল্ডেন ভাস,' 'হিআর'স এ হেলথ টু দী, ল্যাসি' প্রভৃতি কবিতায় প্রেম সম্পর্কে তাঁর টুকরো টুকরো মর্জির পরিচয় পেলেও, এ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাটুকু গাঢ় হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে এই সনেটেই:

"....It was something higher
Than ought that life presents; it was above
All that we see—'twas all we dream of love."

বিশ্বসাহিত্যের অমর প্রণয়ীযুগলকে উপলক্ষ করে প্রেম সম্পর্কে তাঁর পরিপূর্ণ দৃষ্টিকোণের পরিচয় পাওয়া গেল। ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর কথা যথাকালে আলোচ্য।

ডিরোজিওর লেখায় কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম বিষাদময়তার আভাস লুকিয়ে আছে। কিন্তু ঐ বিষণ্ণ, নির্জনতামুখী, নৈঃসঙ্গ্যপ্রিয় ভাবটার সঙ্গে নৈর্ব্যক্তিক অনুভবটা সর্বত্র প্রাপ্য নয়। 'য়োরিক'স স্কাল' সনেটে সেই সুদুর্লভ ব্যাপারটি ঘটেছে। হ্যামলেটের বকলমে কবি সেখানে পরম নৈর্ব্যক্তিতার সঙ্গে বলছেন, "বিহোল্ড! দিস ইজ দি হিউম্যান ফেস ডিভাইন"...ডিরোজিওর 'ডাস্ট' কবিতাতেও মৃত্যু সম্পর্কে এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী দেখি। কোন অভিজাত বংশীয়ের কবর থেকে এক মুঠো ধুলো তুলে নিয়ে সেখানে জুলিআন তুলনীয় উক্তি করছে, 'সী, দিস ইজ ম্যান!" ধূলির দেহ যে ধূলিতেই মেশে, এই পরিণত বোধিটুকু আঠারো বছরের ছেলের পক্ষে অভাবনীয় নিশ্চয়ই!

ইউরোপীয় পর্যায়ের অন্য কবিতাগুলির মধ্যে উল্লেখ্য বিশেষ কিছুই নেই।

সমকালীন জনপ্রিয় ইংরেজ কবিদের অনুসারী এই কবিতাগুলি মোটামুটিভাবে সুখপাঠ্য হলেও, এগুলিই তাঁর দুর্বলতম কবিতা। তবু এদের মধ্যেই 'গুড নাইট' 'কানজোনেট [১, ২],' 'এ নিউ আটলান্টিস,' 'গোল্ডেন ভাস,' 'লাভ'স ফার্স্ট ফীলিংস,' 'অ্যান ইনভিটেশ্যন' প্রমুখ কবিতাগুলির নামোল্লেখ করা চলে।

ডিরোজিওর পাঁচমিশেলী কবিতাগুলিও তেমন কিছু বিশিষ্টতার অধিকারী নয়। মধ্যপ্রাচ্যের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর পড়াশুনো এদের কোনো-কোনোটির মধ্যে পরিস্ফুট—তাঁর ভারতীয় পর্যায়ের মুসলিম আবহময়তার সঙ্গে এগুলির সাযুজ্য বিবেচ্য। 'ওড্স ফ্রম দি পার্সিআন'হাফিজের কবিতার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ,'সং অব আণ্টার' প্রচলিত আরবীয় লোকবৃত্তের অনুপ্রেরণাগত। 'আরব্য রজনী'[৫৮] এবং 'ওমর খৈআম'-[৫৯] এর আভাসও তাঁর অন্যান্য কোনো কোনো কবিতায় দেখা যায় 'ডন জুআনিকস,' এবং 'পোএট্রি' কবিতাগুলির মধ্যে অল্পবিস্তর আত্মকথনের প্রক্ষেপ থাকলেও, মূলত এগুলি পদ্যাকার সুদীর্ঘ কবিতা হওয়ার চেয়ে কিছু বেশি মর্যাদার দাবী রাখে না। 'ম্যানিআক উইডো' একটি দীর্ঘ চারণগাথা—কাব্যমূল্য এরও তেমন কিছু নেই। অবশ্য এটা উল্লেখযোগ্য যে 'জঙ্গীরা' ছাড়া ডিরোজিওর অন্যান্য কবিতার মধ্যে 'ব্যক্তিগত' এবং 'সর্বমানবিক' পর্যায়-দুটির কবিতাগুলিই কাব্যমূল্যের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ।

'ব্যক্তিগত'-পর্যায়ে তাঁর 'টু মাই স্টুডেন্টস' সনেটটি সুবিখ্যাত। ডিরোজিওর প্রথম কবিতার একটি রূপকল্প সম্পর্কে এই গ্রন্থের গোড়ার দিকে আমরা উল্লেখ করেছি: সবে পাখা মেলতে শেখা শিশু-পাখির সঙ্গে তরুণ ছাত্রদের তুলনা করেছিলেন সেখানে বালক কবি নিজের ছাত্রাবস্থায়। নিজে শিক্ষকে পরিণত হয়ে ঐ ইমেজকে তিনি পুনরাবর্তিত করেছেন, আরো সব চিত্রকল্পের বিন্যাসে ছবিটাকে সুসংহত করে:

"Expanding like the petals of young flowers
I watch the gentle opening of your mind
And the sweet loosening of the spell that binds
Your intelletcual energies and powers
That stretch [like the young birds in soft
summer hours]
Their wings to try their strength...."

গুরু ড্রামণ্ডের থেকে উত্তরাধিকারে পাওয়া এই ছাত্রবাৎসল্যই তাঁর জীবনে ছিল

ঝড়ের পাখি

সবচেয়ে মূল্যবান্ অর্জন। মা এবং বোনকে নিয়ে তৈরী ছোট্ট সংসারের বাইরে এরাই ছিল তাঁর বৃহত্তর সংসারে নিত্যসঙ্গী ; এমন কি তাঁর মৃত্যুশয্যাতেও তাঁকে স্বদেশমুক্তির 'আশার আনন্দময়ী বাণী' শুনিয়েছিল তাঁর এই সবে ডানা মেলতে শেখা ছাত্ররাই।[৬০]

ছাত্রদের উদ্দেশে প্রদত্ত তাঁর একটি ভাষণের সন্ধান পাওয়া যায়,[৬১] যাতে তিনি তাঁদের মানবপ্রেম, জ্ঞান এবং যোগ্যতা লাভের আশীর্বাদ করেছিলেন। এই দৃষ্টির আলোকে তাঁর সনেটের সমাপ্তি-অংশটি বিচার্য :

"....When I see
Fame in the mirror of futurity,
Weaving the chaplets you have yet to gain.
And then I feel I have not lived in vain !"

তাঁর এই অভীপ্সা পূর্ণ হয়েছিল। ভবিষ্য-দর্পণে যা দেখেছিলেন, তা সত্য রূপে প্রতিভাত হয়েছিল উত্তরকালে, তাঁর শিষ্যদল 'ইঅং বেঙ্গল' এ দেশের ইতিহাসে চিরায়ত যশোমাল্যের অধিকারী হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত হিন্দু কলেজের সহপাঠীদের উদ্দেশ্যে লেখা মধুসূদনের ইংরাজী একটি সনেটের কথাও হয় ত মনে পড়ে।[৬২]

ব্যক্তিগত উৎস থেকে লেখা অথচ সর্বময়ী রোমান্টিকতা অর্জন করেছে ডিরোজিওর একটি বিস্মৃত কবিতা 'সিস্টার-ইন-ল'। অনুজা আমেলিআ নাকি দাদা হেনরীর কাছে প্রায়ই আবদার করতেন একটি বৌদি পাবার জন্যে! অবশেষে একদিন তিনি প্রাতরাশের থালার নীচে দাদার লেখা একটি কবিতা খুঁজে পেলেন 'বায়না'র জবাব হিসেবে :[৬৩]

"A sister-in-law, my sister dear
A sister-in-law for thee ?
I'll bring thee a star from where angels are
Thy sister-in-law to be."

কবির কল্পনা এরপর উদ্দাম পাখা মেলেছে। "ঠাকুর ঘরের পুণ্যপ্রভা" বোনটির জুড়িদার হতে হলে তার বৌদিকে হতেই হবে "পুণ্য হোমের টিপ"। বোনটির জন্যে হেনরী নাকি "ঝড়ের রাতে পরীরাণীর পাখা ধার করে নিয়ে উড়ে গিয়ে রামধনুর একটি রেখা ধরে আনবেন"—সেই হবে ছোট বোনটির বৌদি! কিংবা তার বৌদি হবে "সাগরজলে ডোবা প্রবালরাণীর মুকুটের মধ্যমণিটি!" শেষ

স্তবকে হেনরীর কল্পনা ধাবমান "পক্ষীরাজের পিঠে সওয়ার" হয়ে— কল্পনালোকে মন্দার ফুলটিকে এনে বোনটির হাতে ধরিয়ে দেবেন তার বায়না মেটাতে।[৬৪]

জানিনা এই অনবদ্য কবিতা হাতে পেয়ে আমেলিআর মনোভাব কি হয়েছিল! কিন্তু এর থেকে একটা জিনিষ বুঝে নেবার আছে; সত্যি সত্যিই বিয়ে করতে চান নি বলেই এত-সুন্দর অথচ-অসম্ভবের পাখনা-ছড়ানো কবিতাটির সাহায্যে ডিরোজিও অনুজাকে নিরস্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন হয়ত বা!

বিয়ে না করতে চাওয়ার পেছনে কোন মনোভাব সক্রিয় ছিল সেটা গবেষণার বিষয়। ডিরোজিওর জীবনীকার টমাস এডোআর্ডসের বক্তব্য অনুসারে, ভাগলপুরে থাকার সময় তাঁর জীবনে একটি প্রণয়ের ঘটনা ঘটে, যেটি মধুর পরিণতি লাভ করে নি কোনো অজানা কারণে।[৬৫] এডোআর্ডস তাঁর সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ হাজির না করলেও, ডিরোজিওর 'ব্যক্তিগত' পর্যায়ের কিছু কবিতা বিশ্লেষণ করলে, তাদের অবলীন প্রমাণে ডিরোজিওর জীবনের এই প্রায় অজানা তথ্য সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা সম্ভব।

ভাগলপুর থেকে 'ইণ্ডিআ গেজেট' পত্রিকার জন্য তিনি যে সব কবিতা লিখে পাঠাতেন, পরে ডিরোজিও নিজেই তাদের মধ্যে অধিকাংশ প্রণয়-কবিতা আর সংকলিত করেন নি নিজের বই দুটিতে, যদিও এই বাতিল কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটিই বেশ ভালো লেখা। এই কবিতাগুলির মূল সুরটা হল প্রথম প্রণয়ের ভীরু এবং হতাশ একটা ভাব। কবিতাগুলি অনুধাবন করলে এদের পেছনে কোনো বাস্তব জগতের শরীরিণীর অস্তিত্ব অনুভব করা চলে! 'টু—' [১, ২], 'এলিজিআক স্ট্যাঞ্জাজ', 'লাভ মি অ্যাণ্ড লীভ মি নট', 'লাইনস রিট্‌ন অ্যাট দি রিকোএস্ট অব এ ইঅং লেডী',[৬৬] প্রভৃতি লুপ্তপ্রায় কবিতাগুলি এই বক্তব্যের সমর্থনে সাক্ষ্য দেবে। এদের সবগুলিই ১৮২৫ সালে লেখা, জানুআরি থেকে অক্টোবরের মধ্যে। এরপরই ১৮২৬-এর গোড়ার কিছুদিনের মধ্যে ডিরোজিও কলকাতায় ফিরে আসেন আকস্মিকভাবে। এবং ১৮২৬ সালের মার্চ মাসে লেখেন "হিআর'স এ হেলথ টু দী, ল্যাসি"। এই কবিতার একটি চিত্রকল্প আমাদের ধারণাকে দৃঢ়তর করে:

> "Though wild-waves roll between us now
> Though Fate severe may be Lassie…"

উদ্দাম ধাবমান এই প্রবাহ সম্ভবত গঙ্গারই। ভাগলপুরবাসিনী 'ল্যাসি' এবং কলকাতানিবাসী 'হেনরী'র প্রণয়ের বাধার রূপকল্প ব্যবহার করতে গিয়ে, স্বাভাবিকভাবেই গঙ্গার উদ্দাম প্রবাহের কথা মনে এসেছে ব্যর্থ প্রণয়ী কবির। ভৌগোলিকভাবে গঙ্গাই ত তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল !

'ল্যাসি'র পরবর্তী প্রণয়কবিতাগুলি আরো উল্লেখযোগ্য। এতদিন পর্যন্ত 'ইণ্ডিআ গেজেট' এর পাতায় তিনি 'জুভেনিস' ছদ্মনামে লিখতেন। এখন থেকে অন্যান্য কবিতা এবং প্রবন্ধ 'জুভেনিস' [এবং 'ইস্ট ইণ্ডিআন'] নামে লিখলেও প্রণয়কবিতাগুলি স্বনামে ['হেনরী'] লেখেন এবং এই কবিতাগুলির সাধারণ শিরোনাম দেন 'অ্যাড্রেসড টু হার, হু উইল বেস্ট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড দেম।'[৬৭] সমস্ত ব্যাপারটুকু নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ তাঁর জীবনের এই অনুদ্ঘাটিত তথ্য বিশ্লেষণে। প্রথম প্রণয়ের যে আবেগমথিত রোমান্স তরুণ কবির মনকে আচ্ছন্ন করেছিল, অন্তরের গোপন প্রকোষ্ঠে তার দীপ্তি অমলিন হয় নি বলেই হয় তো বা তিনি আর বিয়ে করেন নি, এমন সিদ্ধান্তই করা চলে, এত সব মিলিয়ে দেখে।

ব্যক্তিগত উৎস-সঞ্জাত ডিরোজিওর আর দুটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হল 'দি পোএট'স গ্রেভ' [১, ২], প্রথমটি ভাগলপুরে থাকবার সময় লিখেছিলেন তিনি দ্বিতীয়টি মৃত্যুর কিছুদিন আগে। দ্বিতীয়টি একটী সনেট এবং ডিরোজিওর কাব্যের স্বভাবসিদ্ধ মৃদু বিষণ্ণ ভাবটুকু নম্র মূর্তিতে ফুটেছে নিবিড়ভাবে এর মধ্যেও :

"Be it beside the ocean's foamy surge
On an untroden, solitary shore
Where the wind sings an everlasting dirge
And the wild wave, in its tremendous roar
Sweeps o'er the sod !—There let his ashes lie
cold and unmourned !...."

এর তুলনায় প্রথমটি স্পষ্টতই দুর্বলতর :

"...How sweet the spot—the poet's tomb !
There ling'ring fancy silent weeps.
Ane there eternal laurels bloom
To mark the spot where Genius sleeps."

এই কবিতাটি এখন পুরোনো সাময়িক পত্রের পাতায় অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে, ডিরোজিওর আরো অজস্র লেখার মতোই ![৬৮]

দ্বিতীয় কবিতাটির সমাপ্তিটুকুও অনুধাবনীয় :

"There, all in silence, let him sleep his sleep !
No dream shall flit into that slumber deep—
No wandering mortal thither once shall wend,
There, nothing, o'er him but the heavens shall weep.
There, never pilgrim at his shrine shall bend
But holy stars alone their mighty vigils keep !"

মৃত্যু সম্পর্কে ডিরোজিওর নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণের পরিচয় তাঁর 'ডাস্ট' কিংবা 'য়োরিক'স স্কাল', কি 'দি টুম' প্রভৃতি কবিতায় পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে, মৃত্যুর বিরাট মহনীয়তাকে তিনি এখানে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন নিজেরই চেতনার প্রেক্ষিতে, তরুণ অথচ পরিণত প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির আলোয়। ডিরোজিওর আত্মবীক্ষার পরিচায়ক এই সনেটটির সেদিক থেকে একটা বিশেষ মূল্য রয়েছে।

ছয়.

ডিরোজিওর কাব্যের অন্যতম প্রধান স্বরগ্রাম যে মানুষের বন্ধনহীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, এ কথা আমরা তাঁর দেশপ্রেমাত্মক ও গ্রীক এবং ফরাসী কাব্যপর্যায় প্রসঙ্গে বলেছি। তাঁর 'সর্বমানবিক' কাব্যও ঐ মুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাতেই রঞ্জিত।

এদেশে সামাজিক আন্দোলনের প্রগতিশীল অংশের প্রথম নেতা ছিলেন ডিরোজিওই। পরবর্তীকালে আমরা শুধু তাঁর দেশপ্রেমের কথাটুকুই স্মরণ করে রেখেছি। কিন্তু বিশ্বপ্রেমের মধ্যে যে প্রগাঢ় প্রগতিশীলতা আছে—এদেশে তারও অগ্নিহোত্রী তিনিই। রামমোহন যদি 'ভারতপথিক' হন, তাহলে ডিরোজিওকে আমরা সেই মর্যাদা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই এদেশের প্রথম 'বিশ্বপথিক' অভিধাতেও ভূষিত করতে পারি। তাঁর সর্বমানবিক পর্যায়ের প্রতিনিধিত্বমূলক কয়েকটি কবিতার বিচারেই এই কথার স্বপক্ষে যুক্তি মিলবে।

এই পর্যায়ের বিশেষ মূল্যসম্পন্ন কবিতাগুলির মধ্যে 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স', 'ফ্রীডম অব দি স্লেভ', 'মর্নিং আফটার দি স্টর্ম' এবং 'দি পোএট্রি হিউম্যান লাইফ'-এর উল্লেখ করতেই হবে। কোনো বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নয়, সর্বমানবিক চেতনাতেই যে মুক্তির প্রয়াস প্রবহমান—তারই ব্যাখ্যান করেছেন ডিরোজিও এইসব কবিতায়।

'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স'[৬৯] কবিতায় মুক্তির প্রবণতাকে একটি মৃদু প্রদীপের শিখার সঙ্গে তুলনা করেছেন ডিরোজিও। অত্যাচারী ঝোড়ো হাওয়ার বিরুদ্ধে টিঁকে থাকবার জন্যে আপ্রাণ লড়াই করেও শিখাটি অনির্বাণ রইল না। নিজের হৃদয়কে ঐ দীপশিখার সঙ্গে তুলনা করে অতঃপর কবি নিজেকেই প্রশ্ন করেছেন :

> "And wilt thou tremble so, my heart
> When the mighty breathe on thee ?
> And shall thy like this depart ?"

কবিতার শেষ চরণে এসে ডিরোজিও নিজেই এর স্পর্ধিত জবাব দিচ্ছেন :

> "Away ! it cannot be !"

মুক্তিসংগ্রামীর অপরাজের মনোভঙ্গীর প্রকাশ ঐ একটি 'স্পার্টান'-সুলভ চরণে বিবৃত হয়েছে ! মুক্তির ঐ অপরাজেয় মনোভঙ্গী তাঁর 'দি ফ্রীডম অব দি স্লেভ'

কবিতাটিতেও সমানভাবে প্রকাশিত। ১৮২৭ সালে যখন এই কবিতা লেখা হয়, তখনো পৃথিবীর দেশে দেশে ক্রীতদাস প্রথা বর্তমান। রামমোহন যে সময় এ দেশে নারীর স্বাধিকার অর্জনের জন্য লড়াই শুরু করেছেন—সে সময়ও এদেশের নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে ধরে নিয়ে গিয়ে দেশ-দেশান্তরে বিক্রী করে দিচ্ছে আমাদের তদানীন্তন শাসককুলের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীরা। ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয়ের ঢালাও নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন খবরের কাগজগুলি পর্যন্ত ফলাও করে তখন বের করত! মনে রাখতে হবে এই পটভূমিতে এ কবিতা লেখা; বৃটিশ সাম্রাজ্যে দাসপ্রথা রহিত হয় এরও ক-বছর পরে, এর সিকি শতাব্দী পরে শ্রীমতী হ্যারিয়েট বীচার স্টো-র 'আংকল টম'স ক্যাবিন' [১৮৫২] প্রকাশিত হয়েছে; ডিরোজিওর সমানবয়সী আব্রাহাম লিংকনের সাধনা সফল হয়েছে তারো পরে।

এই কবিতার মুখপাতে ক্যামবেলের এক ছত্র কবিতা উদ্ধৃত হয়েছে:

"And as the slave departs, the man returns."

—এই ছত্রটিই এর মূল অনুপ্রেরণা বলে মনে করতে পারি। ক্রীতদাসকে মুক্তির সংবাদ শোনানোর পর তার চিন্তা এবং কাজের ছবি আঁকা হয়েছে:

"He kneels no more; his thoughts were raised;
He felt himself a man
He looked above—the breathe of heaven
Around him freshly beow;
... ...
He looked upon the uning stream
That 'neath him rolled away
Then thought on winds, and birds ane fields
And cried, 'I'm free as they'!"

কবিতার শেষে মুক্তিসংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে প্রশস্তিবাণী:

"And glory to the breast that bleeds,
Bleeds nobly to be free
Blest be the generous hand that breaks
The chain a tyrant gave,
And feeling for degraded man
Gives freedom to the slave."

—এই মানবতাবোধই ডিরোজিওর প্রগতিশীলতার মূল সত্তা।

'সর্বমানবিক' পর্যায়ে ডিরোজিওর আর-একটি উল্লেখ্য কবিতা হল 'মর্নিং আফটার দি স্টর্ম'; উৎসটা ব্যক্তিগত হলেও ব্যঞ্জনাটুকু সর্বময়ী! ঝড়ের পরে প্রকৃতির বিধ্বস্ত রূপটি দেখে কবির মনে প্রকৃতিরই অবলীন ধ্বংসশীল শক্তিগুলির কথা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কবিতার প্রথম পর্যায় এই বিস্ময়ের অনুভূতির মধ্যে সমাপ্ত। দ্বিতীয় অংশে, কবির মনে সহসা এক বিচিত্রতর অনুভূতির সৃষ্টি হল; ধ্বংসের মধ্যেই যে নতুন সৃষ্টির বীজ লুকিয়ে থাকে, এই পরম দার্শনিকতত্ত্বটি বুঝতে পারল তাঁর বিস্মিত মন, এবং

"—Oh! there
I learned moral lesson, which I'll store
Within my bosom's deepest, inmost core;"

'পোএট্রি অব হিউম্যান লাইফ'[৭০] কবিতাটিও, 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' কবিতার মতো ডিরোজিওর মৃত্যুর পরে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং এটিও সাময়িকপত্রের পাতায় বিলীন হয়ে আছে। জগৎ এবং জীবন, বস্তু এবং চেতনার সম্পর্কে তাঁর পরিণতচিন্তা এর মধ্যে প্রগাঢ় রসমূর্তি পরিগ্রহ করেছিল বলে, এটিকে তাঁর দর্শনচিন্তারই লব্ধ ফল বলে গণ্য করা চলে। জীবনের ছোটখাট নানান্ সব টুকরো টুকরো ঘটনার অ্যালবাম সাজানোর মধ্যেই জীবনের যে কাব্য লুকিয়ে রয়েছে, তার চিরন্তন মর্মর গুঞ্জরিত হচ্ছে প্রতিটি মানুষের সুখে-দুঃখে, আশায়-নিরাশায়, তার মনের জ্যোৎস্নায়-অন্ধকারে, বাতাসে-স্রোতোস্বিনীতে। এই গুঞ্জরণই যেন 'শুভায় ভবতু' ধ্বনিতে ডিরোজিওর এই চূড়ান্ত-কবিতার বাণীরূপ ধরেছে। আর এই শুভানুবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে মানুষ, সেই হল সর্বশুভাশুভের নিয়ন্তা:

"But Man has thought to which he giveth form."

এই চেতনাতেই ডিরোজিওর সমগ্র সাধনার ভূমা। মোপার্তুই এবং কাণ্ট ডিরোজিও অভিনিবেশ সহকারে পড়ে ছিলেন। 'ম্যান' আছে বলেই 'থট' রয়েছে এবং সেই 'ম্যান'-ই 'থট' কে 'ফর্ম' এ পরিণত করে, এই বস্তুবাদী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ডিরোজিওর ছিল। যে কোনো 'ফর্ম' ই যে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য, সে কথা প্রতিষ্ঠিত করার মতো দৃষ্টিকোণ অবশ্য কার্ল মার্ক্সের আগে প্রত্যাশিত নয়, তা অবশ্য এখানে বলে রাখা প্রয়োজন।

সাত.

যদিও সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে বিচার করতে গেলে ডিরোজিও মূলত কবিই, তবুও সেই কাব্যপ্রতিভার অনুষঙ্গ হিসেবেই তাঁর গদ্যলেখক এবং সাংবাদিক পরিচয়টিও আলোচ্য! কবিপ্রতিভার আলোচনা উপলক্ষে আমরা তাঁর গদ্যলেখার উল্লেখ আগের অধ্যায়গুলিতে কিছু কিছু করেছি! সে-গুলির সামগ্রিক বিশ্লেষণটুকু বিস্তৃত হবে না নিঃসন্দেহই; তা সত্ত্বেও তার একটা নিজস্ব এবং সুপ্রতিষ্ঠ মূল্য আছে সেটাই অধুনা বিচার্য।

ডিরোজিওর লেখা ইংরেজি গদ্যের প্রথম নিদর্শন হিসেবে যেটি পাওয়া যায়, সেটি একখানি ছোট্ট চিঠি, ১৮২৫ সালের ৮ জানুআরি ভাগলপুর থেকে 'ইণ্ডিআ গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক ড. গ্রাণ্টকে যা লিখেছিলেন তিনি। যদিচ নিছক 'প্রত্ন-নিদর্শন' সংগ্রাহকের কাছে ছাড়া এর কোন আলাদা, বিশেষত সাহিত্যিক, মূল্য নেই, তবু এটি উদ্ধৃত করা গেল :

To

The Editor of The India Gazette.

Sir,

The following original stanzas are at your service, if worthy of appearing in your poets' Corner. Should they be acceptable you will hear often from

Your obedient servant

JUVENIS[৭১]

অতঃপর, এই চিঠির শেষে 'টু—' নামে একটি কবিতা গ্রথিত হয়েছিল, যার নীচে 'Bh—g—poor. 8th. Jan. 1825' এই তারিখ এবং ঠিকানা আছে।

'ইণ্ডিআ গেজেট' ঐসময় থেকে কিছুদিন পর্যন্ত ডিরোজিওর যে সব কবিতা বেরিয়েছে, তাদের অধিকাংশেরই মুখবন্ধ হিসেবে এ ধরণের ছোট ছোট চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এই সব চিঠিপত্র ছাড়াও গদ্য-প্রবন্ধ ডিরোজিও লিখতে শুরু করলেন অল্প দিনের মধ্যেই! অবশ্য কবিতার তুলনায় তাদের সংখ্যা নেহাৎই কম।

ডিরোজিওর সর্বমোট যে প্রবন্ধ-জাতীয় লেখাগুলির সন্ধান বা উল্লেখ পাওয়া গেছে, সেগুলি হল :

১. 'দি মডার্ণ ব্রিটিশ পোএটস্' [৭২]

২. 'টোর্ন আউট লীভস অব এ স্ক্যাপ বুক'[৭৩]

 ক. 'বিগিনিংস, লিটেরেচার ইন ইণ্ডিআ, পোলেমিকস'

 খ. 'চিট-চ্যাট, স্ক্যাণ্ডাল, টি-পার্টিজ'

 গ. 'এডুকেশন ইন ইণ্ডিআ'

৩. থটস অন ভেরীআস সাবজেকটস' : [৭৪]

 ক. 'অ্যাকনলেজমেণ্ট অব এররস্'

 খ. 'ডেফিনিশ্যনস্'

 গ. 'টাইটলস্'

 ঘ. 'লক'স স্টাইল অ্যাণ্ড রিজনিং'

 ঙ. 'হিউম্যান অ্যাকশ্যন'

 চ. 'দি গ্রীকস, অ্যাণ্ড হোআট ইউ হ্যাভ রিসিভড ফ্রম দেম'

 ছ. 'কনক্লুস্যন অব মাই অ্যাড্রেস টু মাই স্টুডেণ্টস বিফোর দি গ্র্যাণ্ড ভ্যাকেশ্যন ইন ১৮২৯'

৪. 'অন মর‍্যাল ফিলজফি' : [৭৫]

 ক. 'হোআট ইজ হ্যাপিনেস, অ্যাণ্ড হোআট ইজ মিজারী'

 খ. 'ইন অর্ডিনারী লাইফ, দি সাম অফ ইভিল এক্সীডস দ্যাট অব গুড'

 গ. 'রিফ্লেকশ্যনস অন দি নেচার অব প্লেজার অ্যাণ্ড পেনস'

৫. 'অবজেকশ্যনস টু দি ফিলসফি অফ এমানুএল কাণ্ট' [৭৬]

এগুলি ছাড়া তাঁর গাথাকাব্য 'দি ফকীর অব জঙ্গীরা' এবং 'দি এনচ্যানট্রেস অব দি কেভ'-এর বিভিন্ন টীকা হিসেবে তিনি যা-যা লিখেছিলেন, সেগুলিকেও অনেক সময়েই ছোটখাট নিবন্ধিকা হিসেবে গণ্য করা চলে।[৭৭]

সামগ্রিক বিচারে, ডিরোজিওকে অবশ্যই পরিপূর্ণ-ভাবে প্রবন্ধকার হিসেবে বিচার করা চলে না, বিশেষত তাঁর প্রচুরায়ত কবিতাগুচ্ছের পাশাপাশি। তাঁর প্রাবন্ধিক মনটির এমন কোন একক বা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও খুঁজে পাওয়া কঠিন যা তার কবিতার পশ্চাদপটে নেই। তবু গদ্যলেখক হিসেবেও তাঁর যে একটা পরিচয় আছে, সেটুকু অবশ্যই বিচার্য।

যে তালিকা ওপরে দেওয়া হয়েছে, খুব সম্ভব তার মধ্যেই তাঁর গদ্য-রচনার

মোট নিদর্শনগুলি বিধৃত। ঐ তালিকার প্রথম এবং শেষ লেখাদুটি আজো অপ্রাপ্ত, শুধু ডিরোজিওর প্রসঙ্গে এদের উল্লেখ কদাচিৎ পাওয়া গেছে।

প্রাপ্ত লেখা এবং অপ্রাপ্ত লেখাগুলির প্রাপ্ত শিরোনাম বিচার করে তাঁর নিবন্ধাবলীকে সাধারণভাবে তিনটি বিশেষভাগে ভাগ করা চলে :

ক. সাহিত্য বিষয়ক, ইতিহাস-বিষয়ক, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিষয়ক

খ. দর্শন-বিষয়ক

গ. হালকা এবং অন্যান্য দৈনন্দিন নানান ঘটনা-বিষয়ক

এদের মধ্যে তৃতীয় ধারাটির সঙ্গে তাঁর সাংবাদিক-সত্তার যোগাযোগটা খুব নিবিড় ; সে কথায় পরে আসছি।

'ইণ্ডিআ গেজেট' পত্রিকায় 'টোর্ন আউট লীভস অব এ স্ক্র্যাপ বুক' শিরোনামের অন্তর্গত নিবন্ধিকাগুলির ওপরে বিবৃত নাম দেখেই তাদের বিষয়-বৈচিত্র্য সম্পর্কে একটা ধারণা করা চলে। একদিকে যেমন লঘু-মর্জির প্রকাশ দেখি 'পোলেমিকস', 'চিট চ্যাট', 'স্ক্যাণ্ডাল', 'টি পার্টিজ' প্রভৃতি লেখার মধ্যে, অন্যদিকে গম্ভীর বিষয়বস্তু নিয়েও সুবিন্যস্ত চিন্তার পরিচয় পাই 'লিটেরেচার ইন ইণ্ডিআ', 'এডুকেশন ইন ইণ্ডিআ' ইত্যাদি লেখায়।

এই জাতের লেখাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল 'এডুকেশন ইন ইণ্ডিআ' নিবন্ধিকাটি। ডিরোজিও নিজে শিক্ষাব্রতী হবার ফলে, তদানীন্তন ভারতবর্ষের শিক্ষাসমস্যার কয়েকটি বিশিষ্ট দিক সম্পর্কে তাঁর অভিবিনিষ্ট ভাবনা স্বভাবতই বিশেষ মূল্যবান। মূলত পূর্ব-ভারতীয়দের [আধুনিক পরিভাষায় 'অ্যাংলো ইণ্ডিআন'] উদ্দেশে এবং অংশত স্কটল্যাণ্ডে পাঠনিরত নিজের ছোট ভাইয়ের প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধের অবতারণা ঘটলেও ডিরোজিও এতে এমন কয়েকটি কথা বলেছেন যার মূল্য হয়তো আজো সমান গুরুত্বপূর্ণ। সামগ্রিকভাবে স্বদেশ-নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়াও যে, নতুনতর জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনে বিদেশ-আগত শিক্ষা বাঞ্ছনীয়—এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার মূল ভিত্তিটা যে নিজের দেশেই প্রোথিত থাকা নেহাতই জরুরী, সেটাও খুব স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত করেছেন তিনি। রামমোহনের লর্ড আমহার্স্টকে লেখা সুবিখ্যাত চিঠি [১৮২৩] এবং মেকলের যুগান্তকারী শিক্ষা-সংস্কারের [১৮৩৫] মধ্যবর্তী সময়ে বাংলাদেশের প্রগতিশীল গোষ্ঠীর প্রধানতম চিন্তানায়কের এই অভিমতের গুরুত্ব স্বভাবতই অপরিসীম। বলতে পারি, শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে এই-নির্দিষ্ট পথে 'ইঅং বেঙ্গল' চলতে পারে নি বলেই, তার 'বিদ্রোহ' নতুন-চেতনাকে চিরস্থায়ী করতে পারে নি।

ডাআরির ছিন্ন-পত্রিকার গুচ্ছ হিসেবে গণ্য তাঁর 'থটস অন ভেরীআস সাবজেক্টস'-এর অণু-ভাবনাগুলির মধ্যে একই সঙ্গে তাঁর মননের দার্শনিক, ইতিহাসবিদ্, আচরণবাদী, অধ্যাপক প্রভৃতি নানান্ সত্তার অল্পবিস্তর ছবি খুঁজে পাই আমরা। তাঁর দার্শনিকতার বৃহত্তর অভিব্যক্তি কাণ্ট এবং মোপার্তুই-সম্পর্কিত লেখাদুটিতে নিঃসন্দেহে প্রতিভাসিত হয়েছে, কিন্তু মনোদর্শনের ব্যাবহারিক প্রত্যয়টি এই নিবন্ধিকাগুলিরও কোনো-কোনোটিতে বিধৃত: যথা, 'ডেফিনিশ্যনস' এবং 'হিউম্যান অ্যাকশ্যন।' উদ্ধৃতি বিচার করে দেখলে এই মন্তব্য আরো সুস্পষ্ট হবে:

'Would men embody their thoughts, that is, act according to their principles, we should see less evil than at present exists.' ৭৮ স্বভাবতই বস্তু এবং সত্তার যে পরিপূরক সম্পর্কের মাধ্যমে মানবিক ক্রিয়াসমূহ নিয়ন্ত্রিত হয়, তার ব্যাবহারিক ভিত্তির উপরে এ ধরণের দর্শন-নিষ্ঠ মনোভঙ্গীর প্রতিষ্ঠা এক পরিণত মননেরই পরিচয়বাহী।

এই ছিন্ন-নিবন্ধিকাগুলির মধ্যে 'দি গ্রীকস অ্যাণ্ড হোআট উই হ্যাভ রিসিভড ফ্রম দেম' লেখাটির নিজস্ব একটা মূল্য আছে। গ্রীস দেশ এবং তার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং শৌর্য ডিরোজিওর মননে যে কি বিপুল প্রভাব ফেলেছিল, তা তাঁর 'গ্রীক' পর্যায়ের কবিতাগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যাবে। ডিরোজিও যে কিছু পরিমাণেও হেলেনীয়-দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন, সে পরিচয়ও তখনই পাওয়া গেছে; তারই গদ্যময় প্রকাশ এই নিবন্ধে হয়েছে, এমন কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। গ্রীসের গরিমা-কীর্তন করতে বসে তার কাছে মানবজাতির ঋণ স্বীকার করার মধ্যে নতুন কিছু নেই, নতুনত্ব হল গ্রীসের গরিমাবর্ণনার মাধ্যমে ইতিহাসের অন্তর্নিহিত দার্শনিক সত্যরূপকে বিশ্লেষণ করাটা।

এই নিবন্ধিকাগুচ্ছের মধ্যেও ডিরোজিওর শিক্ষকসত্তাটিকে সমান উজ্জ্বল দেখি। ১৮২৯ সালের 'গ্র্যাণ্ড ভ্যাকেশন' এর পূর্বমুহূর্তে তিনি ছাত্রদের উদ্দেশে যে সংক্ষিপ্ত ভাষণটি দেন সেটিও এর মধ্যে সংকলিত:

"As your knowledge increases your moral principles will be fotified; and rectitude of conduct will ensure happiness, My advice, to you is, that you go forth into the world strong in wisdom & in worth, scatter the seeds of

love among mankind ; seek the peace of your fellow-creatures, for in their peace you will have peace yourselves."[৭৯]...এ যেন ছাত্রদের উদ্দেশে প্রদত্ত দীক্ষান্ত ভাষণ ! ছাত্রদের উদ্দেশ করে লেখা তাঁর প্রখ্যাত সনেটটির কথা আমরা জানি, সেই আলোকে এই ভাষণটিও পুনর্বিবেচ্য। ডিরোজিওর জীবনবীক্ষণই এতে প্রতিরূপায়িত হয়েছে।

ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ককে ডিরোজিও যে কি চোখে দেখতেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় এই গুচ্ছেরই অন্যতম নিবন্ধ 'অ্যাকনলেজমেণ্ট অব এররস্'-এ। তিনি লিখছেন :

"I, this day [19th. Oct., 1829], most rashly, told one of my students that I disbelieved him—a circumstance which has given me much sorrow. It appeared afterwards that I was mistaken, and I confessed my indiscretion before the whole class."[৮০] এই ভ্রান্তিস্বীকারের মধ্যে ডিরোজিওর চরিত্রের একটি বিশেষ দিক প্রতিভাসিত হয়েছে !

এই নিবন্ধগুচ্ছের 'ডেফিনিশ্যনস', 'টাইটলস', 'লকস' 'স্টাইল অ্যাণ্ড রিজনিং' শীর্ষক লেখাগুলিতে স্বল্পায়ত পরিসরের মধ্যে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সুগভীর রসবোধ একীভূত হয়ে এগুলিকে হৃদয়গ্রাহী করেছে। একক বিচারে এদের কোন বিশেষ মূল্য না থাকলেও সামগ্রিক ভাবে ডিরোজিওকে গদ্যলেখক হিসেবে মূল্যায়ন করতে গেলে এদেরও অবদান আছে বৈকি !

আট.

কাণ্ট সম্পর্কে ডিরোজিও যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন সেটি সে আমলেই বহুপ্রশংসিত হয়েছিল ; "...his 'Objections to the Philosophy of Emanuel Kant' which the Rev. Dr. W. H. Mill, Principal of the Old Bishop's College, and afterwards Canon of Ely, declared before a large audience 'were perfectly original and displayed powers of reasoning and observation which would not disgrace even gifted philosophers."[৮১] এই লেখাটি কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল কি না, তার সংবাদ পাওয়া যায় না ; এবং সেই ১৮৮৪ সালে খোঁজ করেও টমাস এডোআর্ডস এই প্রবন্ধের কোন সন্ধান পান নি।

ফরাসী দার্শনিক পিএর লুই মোরো দ্য মোপাতুর্ই-এর 'অন মর‍্যাল ফিলজফি' শীর্ষক তিনটি নিবন্ধ ডিরোজিও ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন, 'হোআট ইজ হ্যাপিনেস অ্যাণ্ড হোআট ইজ মিজারী', 'ইন অর্ডিনারী লাইফ দি সাম অব ইভিল এক্সীডস দ্যাট অব গুড' এবং 'রিফ্লেকশ্যনস অন দি নেচার অব প্লেজার অ্যাণ্ড পেইনস' উপ-শিরোনাম দিয়ে। মোপাতুর্ইকে নন্দনতত্ত্বের জনৈক ইতিহাসবিদ আখ্যা দিয়েছেন "One of the early precursors of the evolutionary hypothesis"[৮২] বলে। বিবর্তনবাদী চিন্তাধারার অন্যতম অগ্রপথিক মোপাতুর্ই নিউটনীয় গণিতসূত্রের কিছু নতুনতর চর্চায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন। মূলত বৈজ্ঞানিক, এই চিন্তাবিদের লেখা 'মর‍্যাল ফিলজফি' সম্পর্কিত নিবন্ধমালা ডিরোজিও উৎসাহী হয়ে অনুবাদ করেছিলেন ; সুতরাং এতে তাঁর নিজের মননভঙ্গীরও আর একটা পরিচয় মেলে। সর্বোপরি, মোপাতুর্ই-এর বিশ্বজনীন মনোভঙ্গীও তাঁকে অবশ্যই আকৃষ্ট করেছিল, এটাও উল্লেখযোগ্য।

পাওয়া-না-পাওয়া এই সমস্ত নিবন্ধগুলির প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শেষ করার আগে ডিরোজিওর সাংবাদিক-সত্তাটিরও একটু পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। সাংবাদিক-সুলভ বিচিত্রমুখী প্রজ্ঞা তাঁর যে ছিল, সে কথা তাঁর কাব্যের স্বকৃত টীকা ইত্যাদি দেখলেই বোঝা যায়। তাঁর কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে সে সবের বিচার করবার প্রয়াস পাওয়া গেছে। ঐ সব বিচিত্র-

মুখিনতাই তাঁকে আক্ষরিক অর্থেও সাংবাদিক করেছিল। সাংবাদিক ডিরোজিও সম্পর্কে সমসাময়িক একটি পত্রিকায় তাঁর মৃত্যুর পর যে মন্তব্য করা হয়েছিল, সেটি এখানে উদ্ধৃত করা হল :

'ড্রোজু সাহেব বালককালাবধি সম্বাদপত্র প্রকাশে বিরত ছিলেন না প্রথমে [পারথিনন নামক] এক সাপ্তাহিক পত্র দ্বিসংখ্যাবধি প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হন তদনন্তর [হেসপিরস] অবিধেয় প্রতিবাৎসরিক এক সমাচার পত্র কিয়দংশ পর্যন্ত প্রকাশ করিয়া তাহাতে বিবৃত হইয়া অবশেষে ইষ্টিণ্ডিয়ান পত্র স্থাপনপূর্ব্বক লীলা সংবরণ করিয়াছেন।'[৮৩]

এই সমস্ত সাময়িকপত্রের সমস্ত সংখ্যাই এখন বিলুপ্ত। এদের সম্পর্কে পত্রিকাতেও উল্লেখ থাকত ; যেমন, 'পারথিয়ন নামক ইংরেজী সমাচার পত্র বাঙ্গালিদিগের দ্বারা প্রকাশিত হয়, ঐ পত্রিকার ১ সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষা এবং ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগপূর্বক ভারতবর্ষে বাস এই দুই বিষয়ের প্রস্তাব ছিল এবং ও হিন্দুধর্ম ও গবর্ণমেণ্টের বিচারস্থানে খরচের বাহুল্য এতদ্দ্বয়ের উপরি দোষারূপ হইয়াছিল কিন্তু যদিও হিন্দুধর্মালম্বি মহাশয়েরা তদ্দর্শন মাত্রে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব ২ ধন ও পরাক্রমানুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করত তাহা রহিত করিয়াছিলেন ও তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা যাহা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল তাহাও গ্রাহকদিগের নিকট প্রেরিত হইতে দেন নাই তথাপি পত্র প্রকাশক যুবক হিন্দুদিগের সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত হয় নাই…।' [৮৪]
কৃষ্ণমোহনের 'এনকোআরার' এবং ড. গ্র্যাণ্টের 'ইণ্ডিআ গেজেট' পত্রিকাদুটিতেও ডিরেজিও নিয়মিতভাবে স্তম্ভ রচনা করতেন, যেগুলি প্রায়ই ছিল অস্বাক্ষরিত।[৮৫] 'ইণ্ডিআ গেজেট' পত্রিকায় ১৮৩১ সালে প্রকাশিত ঐ রকম একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য ডিরোজিওর লেখা—এমন সাব্যস্ত করেই হিন্দু কলেজের প্রতিক্রিয়াশীল কর্মাধ্যক্ষরা তাঁকে পদচ্যুতও করেছিলেন ।
ডিরোজিও মূলত ছিলেন কবি এবং শিক্ষক !তাই প্রবন্ধকার, দর্শনচিন্তাবিদ্, সমালোচক, সাংবাদিক যে বেশ পরেই তিনি আবির্ভূত হতেন তারই মধ্যে দিয়ে তাঁর প্রকৃত সত্তাটুকু ফুটে বেরোত! জীবনে এবং মনে তিনি যে অন্বেষণকে ব্রত বলে জানতেন, সেই অন্বেষাকেই স্বল্পস্থায়ী জীবন ধরে তিনি মুঠো মুঠো বিলিয়েছেন—প্রবন্ধ এবং কবিতার ছত্রে ছত্রে, ছাত্র-সংঘের মাঝে, প্রহরে প্রহরে। সেখানেই তিনি পূর্ণায়ত ; নতুন যুগের নান্দীকার।

উত্তরাধিকার

এক.

সুদীর্ঘকাল প্রচলিত একটি রীতিতে অভ্যস্ত হবার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের যে কোন অভিনিবিষ্ট ছাত্রই ডিরোজিওর নেতৃত্বে উৎসারিত ইঅংবেঙ্গল-আন্দোলনের সবচেয়ে সার্থক অবদান হিসেবে মধুসূদনকে গণ্য করতে উৎসাহিত হন। ফলত, এ ধরণের প্রতিষ্ঠিত-ধারণা প্রায় সবসময়েই সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয়ের পুনর্মূল্যায়নের প্রতিবন্ধী হয়ে দাঁড়ায়। সাম্প্রতিক প্রসঙ্গও তার ব্যতিক্রম নয়।

একথা অবশ্যই ঠিক যে, হেনরী ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের মনে যে যুক্তি এবং স্বচ্ছচিন্তার আলোক উদ্ভাসিত করেছিলেন, তার দীপ্তি মাইকেলের মানস-বিকাশের সময় অবধিও প্রতিভাত ছিল। স্বভাবতই, সেই আলোকই তাঁর মানসিকতার স্বরূপ নির্ধারণের অন্যতম প্রধান নিরিখ বলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু চিন্তা এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে মাইকেলকে যদি আবার ডিরোজিওর নির্দেশিত পথেরই পথিক বলে গণ্য করি, তবে সে ধারণাও ভ্রান্ত হবে।

মাইকেল হিন্দু কলেজে ভর্তি হন ১৮৩৪ সালে,[৮৬] ডিরোজিওর মৃত্যুর প্রায় তিন বছর পরে, নিজের দশ বছর বয়সে। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে ডিরোজিওর প্রভাব তাঁর ওপর পড়েনি; যাঁর প্রভাবে তিনি প্রথম থেকেই উদ্বুদ্ধ, তিনি ডি. এল. রিচার্ডসন। এ তথ্য সর্বজনজ্ঞাত। অতএব এ আলোচনার শুরুতেই সমসাময়িক বাংলাদেশের ইংরাজি-শিক্ষায় প্রবুদ্ধ নব্য-বুর্জোআ তরুণগোষ্ঠীর এই দুই ধ্রুবপুরুষের মানসিকতার একটি তুলনা করে নেওয়া প্রয়োজন। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবেই, এতক্ষণ অবধি এই বইতে আমরা ডিরোজিওর যে বিস্তৃত মূল্যায়ন করেছি তাঁর সাহিত্য বিচারের অবসরে,—তার মূল কথাগুলি একবার স্মরণ করা বাঞ্ছনীয়।

ডিরোজিও নিজের সমকালে জাতিগতভাবে পুরোপুরি ভারতীয় নন, এমন বলেই গণ্য হতেন; এই ধারণার শিকড় এখনো অনেকের মনেই টিঁকে আছে। কিন্তু চিন্তা এবং ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে ত বটেই, এমন কি জন্মসূত্রেও নিজেকে তিনি ভারতীয় বলেই চিরদিন গণ্য করে গেছেন। কেবল মৌখিক আত্ম-ঘোষণাতেই নয়, এদেশের জাতীয়-ইতিহাসেও তিনিই প্রথম যথার্থ জাতীয়তা-বোধ এবং স্বদেশচেতনার উদ্বোধন করেছিলেন। তাছাড়া, তাঁরই রচনার

মধ্যে দিয়ে বিশ্বচেতনার মুখপাত হয়েছে ভারতবর্ষের সাহিত্যে, এ কথাও স্মরণযোগ্য। এ সমস্ত কথাই ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি আমরা।

সমাজ-দর্শনের বিচারে ডিরোজিও ছিলেন সেই আমলের প্রেক্ষাপটে সর্বপ্রধান বামপন্থী নেতা; কারণ, সামাজিক আন্দোলনে রামমোহনের মহৎ অবদানগুলির কথা স্মরণে রেখেও একথা বলতেই হবে যে তিনি ছিলেন মূলত আপোষপন্থী সংস্কারক। দার্শনিক চিন্তায় নিরীশ্বরবাদী ছিলেন ডিরোজিও; সেখানে তিনি ডেভিড ড্রামণ্ডের যথার্থ ছাত্র। বেকন, লক এবং হিউমের চিন্তাধারার অভিনিবিষ্ট আলোচক[৮৭] ডিরোজিও ছিলেন ভাববাদী ইমানুএল কাণ্টের কঠোর সমালোচকও।[৮৮] আবার বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক মোপাতুর্ইয়ের গবেষণার সঙ্গেও তাঁর ছিল নিবিড় পরিচয়।[৮৯]

ফলত, ডিরোজিওর ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলেন: স্বাদেশিকতার প্রেরণা, স্বদেশের ঐতিহ্যবোধ এবং 'স্বাধীন জাতি' হিসেবে নিজেদের গণ্য করার উৎসাহ, বিদেশী চিরায়ত সাহিত্যপাঠের মাধ্যমে সর্বমানবিক ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, যাবতীয় সামাজিক সংস্কারের জগদ্দল পাথরের ক্ষয়সাধনের উদ্যম, নিরীশ্বরবাদী ও যুক্তিনির্ভর চিন্তার আদর্শ এবং তার ফলস্বরূপ বস্তুবাদী দার্শনিক মন। কিন্তু, ইঅং বেঙ্গলের মূল দলটিতে অভাব ছিল শুধু সৃজনশীল পদবীর একজন যথা-অর্থে কৃতী লেখকের। মাইকেল যদি আর দশ বছর আগে জন্মে ঐ মূল ইঅং বেঙ্গলের গোষ্ঠীভুক্ত হতেম, তা হলে হয়ত এই অভাবের পূরণ হতে পারত বা।

কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। ঐ দশ বছরের ফাঁকে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী যুবশক্তির সামনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর এক প্রতিভাধরের বিশাল ব্যাক্তিত্ব। তিনি, অর্থাৎ রিচার্ডসন পাণ্ডিত্যের নিরিখে ডিরোজিওর চেয়ে ন্যূন ত ছিলেনই না, বরং দীর্ঘজীবন লাভের সুযোগে অনেক বেশিদিন ধরে যুবশক্তির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলেন, এ কথাও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রিচার্ডসনের সঙ্গে ডিরোজিওর বিদ্যা এবং চিন্তার প্রবণতার তুলনা করলে একটি কথাই প্রতীয়মান হবে যে, আসলে তাঁরা সামাজিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে দুই বিপরীতমুখী ধারার অনুসারক। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি-আলোচনায় উৎসাহ দিয়ে যেভাবে নিজের জীবিকাকেও বিপন্ন করে তুলেছিলেন, পরোক্ষভাবে, রিচার্ডসনের পক্ষে তা ছিল অভাবনীয়। তিনি প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কোনও রাজনীতি-চর্চাতেই উৎসাহ দেবার কথা ভাবতে পারতেন না!

রিচার্ডসন নিজস্ব রাজনীতিতে ছিলেন অবশ্য কট্টর টোরী ; 'নিছক' রসসাহিত্যালোচনার গজদন্তমিনারই ছিল তাঁর মনের বাঞ্ছিততম আবাস। আশ্চর্যের বিষয় সে আমলের বাঙালী সমাজের রক্ষণশীল অংশের সঙ্গে একাত্ম হতে তাঁর বাধেনি, যদিচ সমাজের প্রগতিশীল অংশ অর্থাৎ তরুণদলের সঙ্গেই তাঁর যোগাযোগটা ছিল অনেক বেশি নিয়মিত। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক বিরোধ[৯০] কিংবা হীরা বুলবুল নামক জনৈকা নর্তকীর ছেলেকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করার বিষয়ে তাঁর সনাতনীদের সঙ্গে সামিল হওয়া[৯১] ইত্যাদি ঘটনা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

ডিরোজিও যেখানে 'স্বাধীন' ভারতীয়তার চেতনার বীজ বপন করেছিলেন, রিচার্ডসনের মনোভঙ্গী সেখানে ছিল শিক্ষিত যুবকদের আরো বেশি করে ইংরেজিয়ানায় দীক্ষিত করার উৎসাহে ব্রতী। বস্তুবাদী ডিরোজিও যেখানে এদেশে 'এজ অব রিজন' গড়ে দিয়ে গেলেন, রক্ষণশীল রিচার্ডসন সেখানে ছাত্রদের শেখালেন বার্নাড শ'য়ের ভাষায় যাকে বলতে পারি 'ব্যাক টু মেথুসেলা !'

এঁরই প্রত্যক্ষ শিষ্য হলেন মধুসূদন। বিদগ্ধ অধ্যাপকের পাণ্ডিত্য এবং ব্যক্তিত্বে বিমুগ্ধ কিশোর মধুসূদন তাঁকেই জীবনের ধ্রুবনক্ষত্র বলে মনে করলেন। ডিরোজিও চেয়েছিলেন এদেশের যুবশক্তি নিজেদের জাতিসত্তাকে খুঁজে বার করুক, রিচার্ডসন-শিষ্য মাইকেল চাইলেন নিজের সেই জাতিসত্তাকে ভুলে 'সাহেব' হতে।[৯২] নিজের কলেজের অনতিপূর্বকালের সংগ্রামী-ঐতিহ্য তাঁকে নাড়া দেয়নি, যতখানি দিয়েছে 'নীলনয়না সুন্দরী'র কটাক্ষকল্পনা।[৯৩] নিজের বিকাশোন্মুখ সাহিত্যিক-সত্তায় সমসাময়িক সমাজ-আন্দোলনের ধমনীস্পন্দনকে তিনি অনুভব করতে পারলেন না! রামমোহন রায়ের নামোল্লেখ তাঁর সমগ্র সাহিত্যসম্ভারে একবার মাত্র পাওয়া গেল, তাও প্রহসনের পার্শ্ব-চরিত্রের অপ্রয়োজনীয় সংলাপের মধ্যে,[৯৪] ডিরোজিও সেখানে নিরস্তিত্ব, ডেভিড হেআর উপেক্ষিত! বিদ্যাসাগরই একমাত্র নাম, যাঁর কথা মাইকেল-সাহিত্যে স্বল্প হলেও, পত্রাবলীতে সবিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে ; পক্ষান্তরে, হরিশ মুখার্জী সেখানে দু-এক বারই মাত্র উল্লেখিত।[৯৫] কিন্তু জর্জ টমসন, তারাচাঁদ চক্রবর্তী দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' প্রভৃতি বহু আলোচিত সমসাময়িক নানা নাম তাঁর চেতনাকাশে তখন বহু আলোকবর্ষ দূরের বস্তু। মূল ইঅং বেঙ্গল দলের কেবলমাত্র কৃষ্ণমোহনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না-থাকলেও

যোগাযোগ ছিল [যদিও কৃষ্ণমোহনের কন্যার সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের ব্যাপারটা নাটকীয়ভাবে বহুল-প্রচারিত হলেও সর্বৈব ভ্রান্ত ; উৎসাহী পাঠকমাত্রই কৃষ্ণমোহনের জীবনী এবং মাইকেলের খৃষ্টধর্ম গ্রহণের তারিখ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে খোঁজ করলেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবেন] ; কিন্তু সেটাও তাঁর 'এনসাইক্লোপীডিজমে'র জন্যে নয়, 'সাহেবদের ধর্ম' গ্রহণের কারণে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই যদি মধুসূদনের তারুণ্যের মূল্যায়ন হয়, তাহলে উত্তরকালে তাঁর মধ্যে চেতনার অগ্রগামিতা কি করে এল—'মেঘনাদবধ কাব্যে', 'বীরাঙ্গনায়' এবং ব্যঙ্গ-নাটিকা দুটিতে ? এ জিজ্ঞাসা যথার্থ। এখানে মনে রাখা দরকার, যে-মাইকেল কলকাতায় রিচার্ডসনের কাগজে রোম্যান্টিক ইংরেজ কবিদের নকলে কবিতা লিখতেন, তাঁর মননশীলতার পরিধি এবং যিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষকতা এবং সাংবাদিকতা করতে করতে নতুন করে সাহিত্যচর্চা শুরু করলেন, তাঁর মানসিক ব্যাপ্তির মাপ সমান নয়। হিন্দু কলেজে পাঠরত ধনীর দুলাল মধু সেখানে পরিণত হয়েছেন চাকুরীনির্ভর এক বুদ্ধিজীবীতে, সখ থেকে তখন তাঁর স্বভাবে দাঁড়িয়েছে সাহিত্যচর্চা। রিচার্ডসনের কাছে তিনি পাশ্চাত্যের ক্লাসিক্স মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন : মোহাবিষ্ট হয়েছেন ইংরেজ কবিদের স্বপ্নময় রোম্যান্সে। কিন্তু গভীরভাবে পড়েন নি দর্শন, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব কিংবা ইতিহাস, যা ডিরোজিওর ছাত্ররা সাহিত্য-পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই সমান্তরালভাবে অনুধ্যান করেছেন। কলকাতায় থাকতে মাইকেল ভারতের চিরায়ত সাহিত্য-চর্চায় আকৃষ্ট হননি ; সেদিকে তাঁর মন ফিরল ঘর ছেড়ে বহুদূরের দেশ, মাদ্রাজে থাকার সময়ে। রিচার্ডসনের ব্যক্তিত্বের প্রভাবমুক্ত হয়ে মধুসূদনের মনোলোক ততদিনে সাবালকত্বের তটরেখা স্পর্শ করেছে। সাহেবিয়ানার ঝোঁক তখনো কাটেনি, কিন্তু ভারতীয়ত্বের চেতনা ধীরে ধীরে উন্মেষিত হয়ে এক স্বপ্নপ্রদোষ তৈরী করছে মনের দিগন্তে। কলকাতা থেকে গৌরদাস বসাক মারফৎ কৃত্তিবাস-কাশীরাম সংগ্রহ করে পড়ছেন ;[৯৬] বাল্মীকি থেকে শুরু করে প্রাচীন ভারতের কবিকুল-নায়কদের লেখায় তিনি খুঁজে পাচ্ছেন সমুদ্রের স্বাদ।[৯৭] প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের বোধিবৃক্ষের মেলবন্ধন করার মতো পরিণতবুদ্ধিও ততদিনে মাইকেল অর্জন করেছেন। 'আঙ্কল টম'স ক্যাবিন' সংগ্রহ করে পড়ছেন,[৯৮] ভারতীয় পুরাণ-ঐতিহ্য, অধ্যাত্মচেতনা, খৃষ্টীয় পাপপুণ্যতত্ত্ব, পারসিক ধর্মের দর্শনবোধি, ইতিহাসের উপলব্ধি সবকিছু একত্রে সমাহৃত করবার চেষ্টা করেছেন প্রবন্ধের

মধ্যে।[৯৯] তখনো মধুসূদন মিল্টনের মোহ কাটাতে পারেননি, বাইবেলীয় সৃষ্টিতত্ত্বনির্ভর কাব্য লিখছেন,[১০০] কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস-চেতনা তাঁকে প্রবুদ্ধ করছে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে স্বজাতির ঐতিহ্যাভিমানকে অঙ্কিত করবার জন্যে।[১০১] এই স্বনির্ভরতার প্রয়াস এতদিন তাঁর ছিল না। রিচার্ডসনের শিক্ষার প্রভাবাধীন কালে ভারতের ইতিহাসের হারানো পৃষ্ঠা খুঁজে স্বদেশের অতীত গরিমার কথা নিয়ে কবিতা[১০২] লেখার উদ্যম করেও সে অভীপ্সা তিনি ভুলে যেতে পেরেছেন অল্পদিনে।

এমন ব্যাপারটা কিন্তু ডিরোজিআনদের ক্ষেত্রে ঘটেনি; ডিরোজিওর শেখানো বস্তুবাদী মনোভঙ্গী এবং যুক্তিনির্ভর বিচারবুদ্ধি তাঁদের প্রথম থেকেই স্বনির্ভরশীল এবং আত্মসচেতন হতে শিখিয়েছে। নিজের যুগের চেতনায় অগ্রগমন, পশ্চাদপসরণ কোন্খানে এবং কতটা, তাঁরা বুঝতে শিখেছেন তারই অনিবার্য ফল হিশেবে! পক্ষান্তরে মধুসূদনের চিন্তাজীবনে সাবলকত্ব আসতে দেরী হল রিচার্ডসনের ভাববাদী রক্ষণশীলতার আওতায় তাঁর প্রাথমিক জ্ঞানচর্চা ঘটেছিল বলে। সেটা যখন কাটাতে পারলেন তিনি, তখন থেকেই তাঁর মনে তাঁর সৃজনশীল চেতনায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতে শুরু করল সামাজিক অগ্রগামিতার দীপ্তি।

কলকাতায় ফিরে এসে মধু পরিচিত হলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। সমাজ-জীবনেও ততদিন তোলপাড় আরম্ভ হয়েছে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনকে কেন্দ্র করে। বৃহত্তর জাতীয় জীবনে সিপাহীযুদ্ধও ঐ সময়েরই ঘটনা। অল্প কিছুদিন আগে থেকে শুরু হয়েছে নীলচাষীদের ব্যাপক বিক্ষোভ। মধুসূদনের লেখকজীবনেরও সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায় এটি।

কিন্তু এখানেই প্রশ্ন ওঠে এই যে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের মধ্যাহ্ন-প্রহরেও কেন শুধু ঐ সামাজিক ব্যঙ্গ-নাটিকা দুটি ছাড়া আর কোনো লেখায় সমকালের সমাজ প্রতিফলিত হল না যথাযথভাবে? প্রত্যক্ষভাবে সিপাহীযুদ্ধও ত পারল না তাঁর কাব্যকে উদ্দীপিত করতে! ব্যাপকভাবে কথিত হওয়া সত্ত্বেও ইংরাজী 'নীলদর্পণে'র সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই ছিল না।[১০৩] বিদ্যাসাগরের বন্ধুত্ব ত তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারল না বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে একটি মহৎ সাহিত্য রচনায়? 'বীরাঙ্গনা'য় বিধবার প্রেম,[১০৪] এমন কি সধবার বিবাহ-বহির্ভূত প্রেমও[১০৫] সহানুভূতির সঙ্গে দেখিয়ে মধুসূদন আলোড়ন তুলেছিলেন ঠিকই, কিন্তু নিজের সমকালের প্রেক্ষাপটে তাঁকে আঁকবার মতো যুক্তিনিষ্ঠ এবং

প্রগতিমুখিন প্রয়াসে ত তিনি ব্রতী হলেন না? বরং মেঘনাদের চিতাশয্যায় প্রমীলাকে সাড়ম্বর গরিমায় তুলে দিয়ে বত্রিশ বছর আগে বাতিল হওয়া এক প্রতিক্রিয়াশীল লোকবিধিরই মাহাত্ম্য-কীর্তন করলেন প্রকারান্তরে![১০৬] স্মরণ-যোগ্য, ডিরোজিওর যুক্তিবাদী, নিরীশ্বর, ধর্ম-কুসংস্কারবিমুক্ত মন কিন্তু তাঁকে অনুপ্রেরিত করেছিল সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে অগ্নিক্ষরা কাব্য রচনা করতে[১০৭] সহমরণোদ্যতা বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার সঙ্গে তার পূর্বপ্রণয়ী মুসলিম যুবকের মিলন ঘটাবার মতো দুঃসাহস দেখাতেও ভয় পাননি ইঅং বেঙ্গলের দীক্ষাগুরু।[১০৮]

ডিরোজিও যেখানে নিরীশ্বরতাবাদী এবং যুক্তিনির্ভর বস্তুবাদী দার্শনিকতায় প্রবুদ্ধ, সেখানে মধুসূদনের মানসিকতায় ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে এক প্রাচীনকাল-সুলভ দৈবশক্তির প্রতি বিশ্বাস, যার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে অলৌকিকত্বের ব্যঞ্জনাবাহী পৌরাণিক কাহিনী বারংবার অবলম্বন করার মধ্যে। ইতিহাসা-শ্রয়ী 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক লিখতে বসেও তাই তিনি নিয়তিবাদী, অলৌকিকতার চিত্রকর। এ আসল কারণ হল এই যে, যুগসন্ধিক্ষণের লগ্নে আস্থাশীল ও যুক্তি-নির্ভর দার্শনিকতার অভাবজনিত এক অস্থির উদ্দামতা মধুসূদনের চরিত্রের মধ্যেই নিহিত ছিল, যা শেকসপীআর পড়েও কাটেনি, দান্তে পড়েও হটেনি। ঐ যুক্তিঋদ্ধ মানসিকতার অভাবের ফলেই কি-এক বিচিত্র অস্থৈর্য তাঁর ব্যক্তিজীবনকে যেমন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, তেমনি ব্যক্তিজীবনের ভাবানুষঙ্গবাহী শিল্পসৃজনকেও করেছে প্রভাবিত। তাই 'এজ অব রিজন'-এ জন্মেও মধুসূদন আধুনিক যুগসুলভ যুক্তির বদলে কেবলমাত্র আগেকার দ্বারাই পরিচালিত হয়েছেন জীবনে এবং সৃষ্টিতে। ক্লাসিক্‌সের চর্চা তাঁর মনকে পরিশীলিত করলেও যেহেতু তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস এবং দর্শনের চর্চাটুকু নিয়মনিষ্ঠা সমেত হয় নি, তাই অনিবার্যভাবেই তাঁর মনে সৃষ্টি হয়েছে এক প্রবল দোলাচলতা, যা আবার তাঁর সহজাত আবেগ-প্রবণতারই সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। ফলত, তাঁর চেতনার মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে এক স্বতোবিরোধিতার।

এই আত্মবিরোধের নজীর অজস্র। যে সীতা তাঁর কাব্যে সাধ্বিতার প্রতিমূর্তি, প্রবন্ধে তিনিই তাঁর চেতনায় 'এক অবিশ্বস্তা ভার্যা'![১০৯] তাঁর যে রাক্ষস-কল্পনা হাজার বছরের অচলায়তনকে চূর্ণ করে 'মেঘনাদবধকাব্যে' এবং 'বীরাঙ্গনা'য় প্রমূর্ত মানবতার মহত্ত্বে উদ্ভাসিত, সনেটে সেই রাক্ষসই প্রতীকায়িত হয়েছে অশুভ শক্তির দ্যোতক হিসেবে।[১১০] পুরুষকারের প্রতিভূ-স্বরূপ রাবণ

তাঁর মানস-প্রতীক, অথচ তিনি চূড়ান্ত নিয়তিবাদী ; অন্তরের অনুভূতিতে তিনি বহুদেববাদী হিন্দু, দীক্ষায় ক্রীশ্চান, জীবনচর্যায় কোনো ধর্মই মানেন না, কিন্তু নাস্তিকসুলভ চরিত্রও তাঁর নয়, এমনকি সর্বজনীন পারিবারিক ও সামাজিক ধর্মপালনেও তিনি পরাঙ্মুখ ! তাঁর নিজেরই মতে তাঁর লেখার প্রবণতা হচ্ছে 'গ্রীক-সুলভ'।[১১১] কিন্তু এ কোন্ গ্রীক ? হোমারীয় 'প্যাগান' গ্রীকসংস্কৃতি না, সফোক্লিসীয় অমোঘ-নিয়তিবাদী গ্রীক-সংস্কার ? আবার তাঁর নিয়তি-চেতনা ত প্রায় কর্মফলবাদে গিয়ে পৌঁচেছে ; অন্তত তাঁর শ্রেষ্ঠ নায়ক রাবণের ক্ষেত্রে,[১১২] যাকে অনতিপূর্বেই পুরুষকার-প্রতীক আখ্যা দিয়েছি এবং মনে রাখতে হবে 'পুরুষকার' এবং 'নিয়তিবাদ' দর্শনের ইতিহাসে সম্পূর্ণ বিপরীত স্তরের অনুভূতি ! এখানে স্মরণযোগ্য, ডিরোজিও যে-গ্রীসের অনুরাগী, তা ছিল শৌর্য-বীর্য, শিল্প-সাধনার দেশ, মধুসূদনের মতো নিয়তিতাড়িত অনুরাগে গড়া নয়।

শুধু সৃষ্টিতেই নয়, জীবনেও তিনি ঐ বিচিত্র স্ববিরোধিতার অবিরাম প্রবাহে ভেসেছেন ; দুর্দম চারিত্রিক উদ্দামতা তারই অনুষঙ্গবাহীমাত্র ! ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সর্ববিধ রক্ষণশীলতার ঘোর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতিতে রক্ষণশীলতা-মনস্ক হয়ে ওঠেন কিভাবে, সেটাও বিস্ময়কর ! এ প্রসঙ্গে একটি তথ্য এখানে উল্লেখ করতে পারি ঃ ফরাসী প্রজাতন্ত্রীদের সম্বন্ধে কবির মনোভাব কি ছিল তাঁর এক বন্ধুর কথায় জানা যায়, "He bore Inveterate hatred towards the Republicanists."[১১৩] অথচ ভিক্টর উগো সম্বন্ধে তিনি শ্রদ্ধাশীল ![১১৪] জীবন ও মননের এই অজস্র-অনিরসিত জিজ্ঞাসা এবং স্বতোবিরোধের কারণেই তিনি মধ্য-উনিশ শতকের বাংলাদেশের বুর্জোআ-আন্দোলনের প্রগতিশীলতার পুরো শরিক হতে পারেন নি ; সেখানে তিনি অর্ধপ্রক্ষিপ্ত।

তাই ইঅং বেঙ্গলের যথার্থ উত্তরাধিকার মাইকেলে বর্তায় নি। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্যে ইঅং বেঙ্গলের যা ত্রুটি; তাকে তিনি কাঠগড়ায় তুলেছেন, কিন্তু তার যা অভিনন্দেয়, সেটি আঁকবার বেলায় তাঁর লেখনীর মসি-বিলুপ্তি ঘটল কেন ? ভারতীয় নব্য-বুর্জোআর শ্রেণীচৈতন্য যে তাঁর তৈরী হয়েছিল, তার হদিশ তো 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'তে দেখেছি, যেখানে অত্যাচারী সামন্তপ্রভুর বিরুদ্ধে ভূমিহীন কৃষক এবং শ্রেণীচ্যুত মধ্যবিত্ত এক হয়ে দাঁড়িয়ে তাকে পর্যুদস্ত করেছে। তাহলে তিনি নিজে যে নব্য-বুর্জোআ-

প্রগতিশীল সমাজের অংশ, তার সেই অগ্রগামী ভূমিকার চিত্রায়ণে অক্ষম হলেন কেন? তাকে যথাযথভাবে মেনে নেবার মতো অবসর তাঁর দৈবপ্রবণ মনের কোথাও জোটেনি বলেই কি? ডিরোজিওর মশাল তুলে নিয়ে তিনি চলতে চাননি কি সেইজন্যেই?

আসলে নব্য-বুর্জোআ পারিপার্শ্বিকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়লেও মধুসূদনের চিত্তের গভীরে একটা ফিউডাল-প্রবণতা ছিল যা তাঁর জীবনকে বিশ্লেষণ করলে বুঝি। হীনভাবে জমিদারকে চিত্রিত করলেও নিজে সম্পত্তির অধিকারের জন্য বিমাতাদের সঙ্গে মামলা করতে ছাড়েন নি। রেবেকা এবং অঁরিএতা-সম্পর্কিত আনুপূর্বিক ঘটনাবলীও অনুরূপ মানসিকতারই পরিণতি। বিদ্যাসাগর ছাড়া তাঁর পরিণত বয়সের প্রায় সব বন্ধুই হয় রাজা, নয় রাজাশ্রিত, নয় বিরাট বিত্তবান্। এরই অন্যতর প্রকাশ পূর্বোল্লিখিত ফরাসী প্রজাতন্ত্রীদের প্রতি বিরাগে। এমন কি যে দান্তে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে চিরজীবন দেশ থেকে নির্বাসিত রইলেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্যও মাইকেল ইতালীর সম্রাট ছাড়া আর কারুকে তুলে দিতে পারলেন না! 'মেঘনাদবধে'র ঐ সাড়ম্বর ভাষাও এক অর্থে ফিউডাল-মানসিকতা বই কি!

এই ব্যাপারটাকে দার্শনিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায় এভাবে: হিন্দু কলেজ এবং তাঁর ছাত্রমণ্ডলী সম্পর্কে ডিরোজিও এবং মধুসূদন—দুজনেরই একটি করে সনেট আছে: বিষয় যদিও এক কিন্তু তাদের বিশ্লেষণের বৈপরীত্য বিচার করলেই ঐ প্রশ্নের জবাব পাই। ডিরোজিও লিখছেন:

> "Your intellectual energies and powers
> That stretch [like young birds in soft summer hours]
> Their wings, to try their strength. O, how the winds
> Of circumstances, and freshening April showers
> Of early knowledge, and unnumbered kinds
> Of new perceptions shed their influence.
> And how you worship truth's omnipotence."১১৮

আর মাইকেলের লেখায় দেখি:

"...Whose angel-tongues
Shall charm the world their enchanting songs
And, like a god, unveil the hidden face
Of many a planet to man's wondering eye."[১১৬]

অর্থাৎ যে যুবশক্তির মূল্যায়ন ডিরোজিও করলেন মনীষা, প্রতিবেশ, প্রজ্ঞা ও নতুন-উপলব্ধির প্রেক্ষাপটে, মাইকেলের কাছে তাদের বিচার হল দেবদূত-কল্পতা এবং মোহনীয়া যাদুবিদ্যার আবরণের মধ্যে! ডিরোজিওর অনুভূতিতে এদের সত্য-সার্বভৌমত্বের সন্ধানটাই ভূমা, পক্ষান্তরে মাইকেল প্রত্যক্ষ করতে চাইলেন এঁদের মাঝে 'দেবতার অমর মহিমা'! ঐ 'ইনটেলেকচুআল এনার্জি', 'উইণ্ডস অব সারকাম্‌সট্যান্সেস,' 'আর্লি নলেজ' এবং 'নিউ পার্সেপশ্যন'-টি তাদের ইঅং বেঙ্গলের সত্যস্বরূপ, আর তাই 'ট্রুথ'-ই তাদের কাছে 'অমনিপোটেণ্ট'। মাইকেলের কল্পিত 'এঞ্জেল-ট্যঅং' এবং 'গড-লাইক' ইঅং বেঙ্গল ডিরোজিওর ভাবনা এবং সাধনার যথার্থ উত্তরসূরী যে নয়, এইটাই আমাদের প্রথা-প্রতীতি।

অথচ মাইকেলের একেবারে প্রথম পর্যায়ের কবিতায় ডিরোজিওর লেখার ঢঙে দেশপ্রেমের আবেগ মন্থিত হতে অন্তত একবারও আমরা দেখেছি তাঁর 'King Porus' কাব্যে :

"And where art thou fair freedom ; thou
Once goddess of Ind's sunny clime ;
When glory's halo 'round her brow
Shone radiant, and she rose sublime."

কিন্তু মাইকেল যে আদৌ ডিরোজিআন নন, তার প্রমাণ ঐ কবিতারই একেবারে শেষের দিকে এসে পৌঁছুলে আপনা থেকেই হাজির হবে চোখের সামনে :

"Thou'rt fall, alas ! no more to rise
A sad hopeless sacrifice
To glut proud time's remorseless eyes"[১১৭]

ডিরোজিওর মতো স্বাধীনতার সাধনা, স্বদেশের অতীত মহিমার বন্দনা দিয়ে শুরু করতে পারলেও, কিন্তু তাঁর মতো ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় উদ্বেল হয়ে উঠতে পারেন নি মধুসূদন ; ক্লান্তি এবং হতাশার গভীর চোরাবালিতে তলিয়ে গেছে তাঁর একবার আকস্মিকভাবে জেগে ওঠা দেশপ্রেম! তাঁর আগে-পরে যাঁরা

যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ডিরোজিওর আলোয় চোখ মেলেছেন, তাঁরা প্রতিভায় হয়ত, হয়ত কেন নিশ্চয়ই, মধুস্থদনের সমকক্ষ নন ; কিন্তু তাদের লেখার ঐ ক্লান্ত আশাহীনতা নেই, বরং ডিরোজিওর মশালের আলোর উত্তাপকে তাঁরা আরে বাড়িয়ে তুললেন কেউ কেউ। মাইকেলের দেশপ্রেমের ক্ষণপ্রভা তখন নির্বাপিত।

দুই.

মধুসূদন যদি যথা অর্থে ডিরোজিওর চিন্তা এবং সৃষ্টির উত্তরাধিকারী না হন, তখনই প্রশ্ন ওঠে তাহলে সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্র ছাড়া আর কোথাও ডিরোজিওর সাধনার উত্তরসরণ ঘটেনি? দেশ এবং জাতির মনে যে নতুন যুগের অভ্যুদয় ডিরোজিও থেকে শুরু, যার দ্বান্দ্বিক প্রকাশ ঘটেছে তাঁর নিজের সমকালে, সেটি কি তাহলে নিতান্তই নিস্ফলা?...এই সংশয়ের জবাবে ডিরোজিওর লেখা থেকেই উদ্ধৃত করে বলি: "Away it can not be!"[১১৮] কারণ সত্যিই যদি তাই হতো, তবে ইতিহাসের বস্তুবাদী বিবর্তনের সূত্রই ভুল বলে প্রতিপন্ন হয়ে পড়ত যে!

ডিরোজিওর কাজ এবং চিন্তা—এ দুয়ের মূল স্বরগ্রাম ছিল অন্ধ-সংস্কার থেকে এবং যে কোনো ধরণের অন্যায় বন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়াস। সেই সংস্কার এবং বন্ধন, সামাজিক অনাচার, অজ্ঞ মধ্যযুগীয়তা, জাতীয়তাবোধহীন অচেতনতা বা ঐ রকম যে-কোন কিছুরই স্বরূপে তাঁর কাছে হাজির হয়ে থাকুক না-কেন, উদার এবং প্রগতিশীল যুক্তিবাদী মন নিয়ে তিনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন! পরবর্তীকালে সেই লড়াইয়ের ধারাটা যাঁরা বজায় রেখেছেন এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, তাঁরাই হলেন তাঁর যথার্থ উত্তরসূরী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে আজ অবধি যে সব প্রগতিমুখিন আন্দোলন বারংবার রক্ষণশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক শক্তিগুলির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আসছে, সেই সমস্ত আন্দোলনেরই শরিক যাঁরা, খাঁটি অর্থে ডিরোজিওর উত্তরাধিকারী তাঁরাই।

ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ শিষ্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি 'নাট্যচিত্র' দিয়ে আমাদের সাহিত্যে সেই উত্তরসরণের শুরু।

'The Persecuted' নামে তাঁর লেখা যে, একটি বইয়ের কথা এখন আমরা ভুলেই গেছি প্রায়, সেখানেই প্রথম সাময়িক-এবং-সংবাদপত্রের বাইরে ডিরোজিয়ানদের পাল্টা লড়াইয়ের মুখবন্ধ। ডিরোজিও বেঁচে-থাকা-কালেই কৃষ্ণমোহনের ঐ বই বেরোয়, ১৮৩১ সালের নভেম্বরে। নিছক সাহিত্যগতভাবে আলোচনা করলে লেখাটি দুর্বল সন্দেহ নেই, কিন্তু এর প্রকৃত মূল্য অন্যত্র

নিহিত। কৃষ্ণমোহনের নিজের কথাতেই, "the consistencies and the blackness of the influential members of the Hindu community"[১১৯] দেখানোই ছিল তাঁর মুখ্য অভিপ্রায়।

কৃষ্ণমোহনের বইয়ের সম্পূর্ণ নামটি হলো: 'The Persecuted or Dramatic Scenes illustrative of the present state of Hindoo society in Calcutta.' সমকালের 'হিন্দু যুবকদের হাতে উৎসর্গিত' এই বই লেখা হয়েছিল তাদের "virtues and mental energies"-কে প্রশংসা করে, যা আবার "elevate man in the estimation of a philosopher."[১২০] স্পষ্টতই, ডিরোজিওর শিক্ষার মূল প্রেরণাটিই এই বই লেখার পেছনে সক্রিয়। সংস্কারমুক্ত ডিরোজিআন কৃষ্ণমোহন নিজেই যেন এই নাট্যচিত্রের নায়ক রূপে হাজির হয়েছেন।[১২১]

নব্য-শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ বেণীলাল সেকালীন ইঅং বেঙ্গলীয় রীতিমাফিক সংস্কার-মুক্ত হয়ে সবান্ধবে 'নিষিদ্ধ' পান ভোজন ইত্যাদি প্রায়ই করে থাকে।[১২২] এরই অনিবার্য পরিণতি বেণী এবং তাঁর পিতা মহাদেবের মধ্যে মতান্তর, আর তার সূত্র ধরে তর্কালঙ্কার এবং বিদ্যাবাগীশ নামে দুই সমাজপতি এবং লালচাঁদ নামে এক পত্রিকা সম্পাদক বেণীকে প্রথমে বাড়িছাড়া এবং তার পরে জাতিচ্যুত করতে উদ্যোগী হয়। এদের সঙ্গে যোগ দেয় 'গোঁড়া হিন্দু' বলে পরিচিত কামদেব, দেবনাথ, রামলোচন-প্রমুখ। পুত্রস্নেহ এবং সমাজপতিদের শাসানি—এই দুয়ের মধ্যে পড়ে বিপর্যস্ত মহাদেব কিছু টাকা দিয়ে তর্কালঙ্কারদের মুখ বন্ধ করতে চান। এর ফলশ্রুতি টাকার বখরা নিয়ে দুই পণ্ডিতে বিবাদ। অবশেষে বেণীলালকে ঘর ছাড়তে হলোই। তার পাশে এসে দাঁড়াল শম্ভুনাথ, চন্দ্রকুমার, ইন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রগতিশীলরা ত বটেই, এমন কি ভৈরব, মথুরামোহন, সম্বলচাঁদ, হরিচাঁদ প্রমুখ মধ্যপন্থীরাও। এই কাহিনীর এখানেই শেষ।

প্রকারান্তরে এই বইটি একটি ঐতিহাসিক দলিলই হয়ে উঠেছে। যে সামাজিক প্রতিক্রিয়ার শক্তি ডিরোজিওকে জীবিকাচ্যুত[১২৩] এবং কৃষ্ণমোহনকে পরিবার থেকে বিতাড়িত করেছিল,[১২৪] তার বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রামের এই ছবি আঁকাই হল ডিরোজিওর সাধনার যথার্থ উত্তরসরণ। কৃষ্ণমোহনের এই লেখায় প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে লড়াইতে বামপন্থী [তখনকার বিচারে] এবং মধ্য-পন্থীদের মধ্যে যে সমঝোতা দেখানো হয়েছে সেটা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য। ডিরোজিওর ছাত্র কৃষ্ণমোহনের সেটা না বোঝার কথা নয়। ডিরোজিওর

বিতাড়নকালে, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, উইলসন হেআর প্রমুখ মধ্যপন্থী বুদ্ধিজীবীরা তাঁকেই সমর্থন করেছিলেন প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে। মধ্যপন্থী রামমোহনের সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন ডিরোজিও এবং তাঁর অনুগামী ছাত্ররাই। পরবর্তী সময়ে মধ্যপন্থী ও ইংরেজ বুদ্ধিজীবী জর্জ টমসনের সঙ্গে বামপন্থী 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র যোগাযোগ ঐ অনিবার্য ঐতিহাসিক সূত্রেরই সত্যতার প্রমাণ।

সাহিত্যে এবং সমাজ-ভাবনায় ডিরোজিওর আর একটি যে প্রধান অবদান দেশপ্রেম বা স্বদেশচেতনা, তার প্রত্যক্ষ উত্তরসাধনা অবশ্য ডিরোজিআন বলে পরিচিত কেউ সেভাবে করেন নি, অন্তত সাহিত্যের ক্ষেত্রে। ডিরোজিওর ভাবধারাকে আরও অনেকদূর যাঁরা এগিয়ে নিয়ে গেলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই রিচার্ডসনের ছাত্র। দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখের 'রাজদ্রোহমূলক' বক্তৃতার কথা[১২৫] পরবর্তী সময়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ঠিক একই রকম তীব্র স্বদেশভাবনার যে সমসাময়িক আরো ক-জন তরুণ বুদ্ধিজীবী প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন, সে তথ্য প্রায় অনালোচিতই।

এঁদের মধ্যে প্রথম নাম করতে হবে কাশীপ্রসাদ ঘোষের। কাশীপ্রসাদ ইঅং বেঙ্গলের যুগের মানুষ হয়েও চিন্তাভাবনায় খানিকটা রক্ষণশীল ছিলেন ঠিকই,[১২৬] কিন্তু ইতিপূর্বে সে যুগের সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে যে নব্যবুর্জোআ-সুলভ আত্ম-বৈপরীত্যের কথা বলছি, তার সূত্র ধরেই তাঁর মধ্যেও কতকগুলি প্রগতিমুখী চেতনার কথা উল্লেখযোগ্য—যাদের ভিতর ঐ স্বদেশচিন্তার কথাও বিশেষভাবে রয়েছে। ১৮৩০ সালে তাঁর 'The Shair & other Poems গ্রন্থ প্রকাশিত হলে দেশভাবনার ক্ষেত্রে ডিরোজিওর লেখার একজন দোসর মিলেছিল। ডিরোজিওর 'To India, My Native Land' এবং 'The Harp of India' কবিতা দুটিকে যেন আদর্শ রূপে খাড়া করেই তাঁর ঐ বইতে 'The Veena, or the India Lute' কবিতাটি লেখা:

> "Lute of my country! Why dost thou remain
> Unstrung, neglected, desolate and bound
> With envious Time's and Ignorance's chain?
> Ah! Lonely Lute! Who heareth now thy sound?
> Which oft, as 'twere in gladness did rebound
> In courts, responsive to the tuneful band.

Who fired with various transports all around,
They magic chords with love and rupture
behinding command..."[১২৭]

ঐ বইয়ের মূল কবিতা 'The Shair'-এর মুখবন্ধেও ঠিক একই ধরণের একটি কবিতা আছে:

"Harp of my country ! Pride of yore !
Whose sweetness notes are heard no more
O ! give me once to touch thy strings"[১২৮]

—এ ত হুবহু ডিরোজিওরই "Harp of my country ! Let me strike the strain"-এর নিশ্চিত প্রতিধ্বনি। ঠিক একই জিনিষ ঐ কাব্যের সমাপ্তিতেও:

"Land of the Gods and lofty name ;
Land of fair and beauty's spell ;
Land of the bards of mighty fame ;
My Native Land ! for e'er farewell"

বর্ণনা, মেজাজ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কাশীপ্রসাদ বহু ক্ষেত্রেই ডিরোজিওকে প্রবলভাবে অনুসরণ করেছেন। তবে সেটা এক্ষেত্রে আলোচ্য ব্যাপার নয়; ডিরোজিওর চিন্তার মৌলিক প্রবণতাগুলির কতটা পরবর্তীরা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সেইটিই বিচার্য।

ঐ দেশপ্রেমের প্রেরণা অন্যান্য লেখকদের মধ্যেও কমবেশী সঞ্চারিত হয়েছিল ডিরোজিওর অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে। ডিরোজিওর নন, তবে হিন্দু কলেজেরই ছাত্র গুরুচরণ দত্তের 'School Hours' বইয়ের মধ্যে যে মাতৃভূমি বন্দনা দেখি, সেটা ডিরোজিওর প্রেরণাগত নিঃসন্দেহে:

"Dear native country ! famed in olden time-
Where heroes bled, and poets sweetly sung
Striking thy Harp-spring that symphonies rung :
Blest region ! Surrosoty's fav'rite clime."

১৮৩৮-এ গুরুচরণের এই কবিতা প্রকাশিত হবার আগেই কিন্তু এদেশের দেশপ্রেমাত্মক সাহিত্যের আরো তীব্র একটি পর্যায় দেখা দিয়েছে। শুধু অতীতের স্মৃতিচর্যা নয়, কিংবা ভবিষ্যতের স্বর্ণোজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষা নয়—এই নূতন

পর্যায়ের দেশপ্রেমাত্মক সাহিত্যের মধ্যে যে প্রবণতা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, তা হল ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সশস্ত্র সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষা। বস্তুত পক্ষে ডিরোজিও যেখানে পৌঁছেছিলেন স্বদেশ-চিন্তার ক্ষেত্রে, এই পর্যায়ের লেখকরা ঠিক সেখান থেকেই যাত্রা শুরু করেছেন বলতে পারি। ডিরোজিওর স্বদেশ-প্রেমের প্রদীপ থেকে এঁরা বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষার মশাল জ্বলিয়েছিলেন বললেই বোধ হয় আরো ভালো করে বলা হয়।

এই প্রসঙ্গে দুটি ছোট নভেলেটের কথা উল্লেখ করব। ১৮৩৫ সালে কৈলাসচন্দ্র দত্ত এবং তার দশ বছর বাদে তাঁর জ্ঞাতিভাই শশীচন্দ্র দত্ত এই কাহিনী দুটি রচনা করেছিলেন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য। শশীচন্দ্রের লেখাটি উত্তরকালে তাঁর একাধিক বইতে সংকলিত হলেও, কৈলাসচন্দ্রের লেখাটি আর সেই সুযোগ পায়নি।

ঐ লেখাটি, 'A Journal of Forty-eight Hours in the year 1945' প্রকাশিত হয় ১৮৩৫ সালের ৬ জুন তারিখের 'The Calcutta Literary Gazette' পত্রিকায়। কল্পনা করা হয়েছে একশ দশ বছর পরে [অর্থাৎ, ১৯৪৫ সালে], কলকাতার অ্যাংলো-ইণ্ডিআন কলেজের প্রাক্তন ছাত্ররা ভুবনমোহনের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়েছেন ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করার অভিপ্রায়ে। দেশের মান্যগণ্য অনেকেই গোপনে তাঁদের সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হলেন। এপ্রিলের এক সন্ধ্যার বিদ্রোহীরা আত্মপ্রকাশ করলেন একটি বিশাল জনসভায়। ভারতের বৃটিশ শাসনের দু-শতাব্দীর বেদনা ও যন্ত্রণার ছবি এঁকে ঐ সভায় ভুবনমোহন ঘোষণা করলেন: "Let us unfurl the banner of freedom and plant it where Britannia now proudly stands."[১৩১]

ইংরেজ সৈন্য এসে মিটিং ভেঙে দেয়—দুপক্ষের লড়াইতে বহু হতাহত হয়। বড়লাট লর্ড কেল-বুচার [!] এবং প্রধান সেনাপতি কর্ণেল জন ব্লাড-থার্স্টি [!!], কর্ণেল ব্যালানকোর্ট প্রমুখ সরকারী কর্তারা এবং সরকারের দোহার-স্বরূপ পত্রিকাগুলি একযোগে মিথ্যা প্রচার এবং বিদ্রোহ দমনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল এরপরেই। বিদ্রোহের ঠিক আগেই বিদ্রোহী দলেও ভাঙন ধরল বটে, কিন্তু তাতে সংগ্রামের উদ্যমে ভাটা পড়ল না।

একদিন পরে বিদ্রোহী তরুণরা এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে জড় হতে লাগলেন সন্ধ্যার মুখে। হাজার হাজার সশস্ত্র তরুণের বাহিনী ভুবনমোহনের নেতৃত্বে কেল্লা

[ফোর্ট উইলিঅম] আক্রমণ করল। ইংরেজ সেনাপতি যুদ্ধে নিহত হলেও শেষ লড়াইতে ভুবনমোহনরা হেরে গেলেন। গিলোটিনে তাঁর মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও তিনি একটি উদ্দীপনাময়ী ভাষণে ইংরেজ শাসকদের সন্ত্রস্ত করে তোলেন :

"I have shed my last blood in defence of my country and though the feeble spark within my frail frame, I hope you will continue to perciver in the course we have so gloriously commenced."১৩২

দ্বিতীয় কাহিনীটির প্রেক্ষাপট আলাদা। ১৯২০ সালে ওড়িষ্যার আদিবাসী-দের বিপ্লবের ফলে কেমন করে ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের বুকের ওপরে ওড়িষ্যা প্রজাতন্ত্র গড়ে উঠল তারই কল্পকাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে এই 'The Republic of Orissa: Annals from the Pages of the Twentieth Century' নভেলেটিতে। ১৮৪৫ সালের ২৬ মে 'Saturday Evening's Hurkuru'-তে প্রকাশিত হয় এটি সর্ব প্রথম।

১৯১৬ সালে ইংরেজ সরকার নতুন করে দাসপ্রথার প্রবর্তন করলে গোটা দেশের সঙ্গে সঙ্গে ওড়িষ্যাতেও বিক্ষোভ প্রবলভাবে দেখা দিল! ভীখু বারিক, জগমোহন, গোকুলদাস, অর্পতি, বৃন্দাবন সর্দার প্রমুখ ওড়িষ্যার নেতারা গোটা দেশের সামনে একটি আদর্শ হয়ে উঠলেন এই উপলক্ষে। প্রাথমিক ভাবে ইংরেজবাহিনী দু' একটা লড়াইতে সাফল্য লাভ করায়, সরকার দেশব্যাপী বিক্ষোভের গুরুত্ব বুঝতে অসমর্থ হল। কিন্তু ১৯১৮ সালে পরবটনার যুদ্ধে ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ জর্জ প্রাউডফুটের কল্পনাতীতভাবে পরাজয় ঘটায়। সরকার পক্ষ সাময়িকভাবে একটা আপোষ রফার মাধ্যমে নিজেদের ঘর গুছিয়ে নিতে চাইল।

ইতিমধ্যে নলিনী নামে একটি মেয়ের প্রেম না পেয়ে বিপ্লবী দলের গোপীদাস প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে শত্রুপক্ষে যোগ দিল : ঘটনাচক্রে, নলিনীর প্রণয়াস্পদ জগদাস মাইথিপো গোপীর হাতে বন্দী হয়। নলিনী স্বয়ং ফকিরের ছদ্মবেশে শত্রুশিবিরে ঢুকে এক ফাঁকে তাকে মুক্ত করে নিয়ে পালায়—কিন্তু গোপী সদল-বলে ওদের পিছু ধাওয়া করে। যুদ্ধ হলে গোপীর সহচরদের জগদাস নিহত করলেও, গোপী নিজে বেঁচে পালায়। কিন্তু ঐ লড়াইয়ের ফাঁকে নলিনীকে সে হত্যা করে।

নলিনীর বৃদ্ধ পিতা লক্ষ্মণদাস খুন্দাতি আদিবাসী কিঙারিদের নিয়ে এক

বিশাল বাহিনী গড়ে ইংরেজ এবং তাদের তাঁবেদার বাহিনীকে আক্রমণ করলেন প্রতিশোধ নিতে। আশি হাজার ওড়িয়া ও আদিবাসী সৈন্যের আক্রমণের মুখে প্রাউডফুটের বাহিনী একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেল, ১৯২১ সালের ১৫ অকটোবর তারিখের ঐ যুদ্ধে। জগদাস এবং গোপী পরস্পরের হাতে নিহত হয়ে শেষ দেনা-পাওনা মেটাল ঐ একই সঙ্গে। এর কদিন পরেই ওড়িষ্যা নিজেকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করল; পিল্লীভীতের [দিল্লী ?] ইংরেজ সরকার আর কোনো দিন তাকে আক্রমণ করার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি। গোটা ভারতবর্ষের কাছেই স্বাধীন ওড়িষ্যা নতুন যুগের দিশারী হয়ে রইল।[১৩৩]

ডিরোজিওর হাতে যা ছিল দেশপ্রেমের বীণার ঝঙ্কার, তাঁর পরবর্তীদের হাতে অল্প কালের মধ্যেই যেটি হয়ে দাঁড়াল রণভেরীর হুঙ্কার; এক শতাব্দী পরের কল্পিত স্বাধীনতা যুদ্ধের এই কাহিনীগুলি পরবর্তীকালে বিস্মৃত হয়ে গেল যে কিভাবে সেটাই বিস্ময়ের ব্যাপার! ইংরেজী-শিক্ষিত নতুন প্রজন্ম যে সংগ্রামী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে এ ভাবে, সে নিয়ে সমসাময়িক ইংরেজ সাংবাদিকরা বিচলিত হয়েছিলেন [১৩৪] বটে, তবে শাসক গোষ্ঠী এক বিচিত্র ঔদাসীন্যে এগুলিকে উপেক্ষা করেছিল সম্ভবত বেশি দূরদর্শী ছিল বলেই। উত্তরকালে কৈলাসচন্দ্র এবং শশীচন্দ্র দুজনেই অবশ্য বৃটিশ আমলাতন্ত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গিয়ে ছিলেন[১৩৫] [অবশ্য শশী 'Shunkar : A Tale of the Mutiny' [১৩৬] নামে সিপাহী উপরে বাস্তব তথ্যভিত্তিক একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন], তবুও আমাদের স্বদেশ-ভাবনার উদ্বোধনের যুগে সৃষ্টি হওয়া এই দুটি কাহিনীর অসীম গুরুত্বকে কিছুতেই কি অস্বীকার করা করা চলে? ডিরোজিওর আদর্শেরই যথার্থ বিকাশ এদের মধ্যে ঘটেছিল।

মধ্যবিত্ত-সতর্কতায় যে পরিণত বয়সে কৈলাস এবং শশী বিপ্লব-চিন্তা থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়েছিলেন, সেটাকে একটা প্রতীকী ব্যাপার বলে গণ্য করতে পারি। ডিরোজিওর প্রদীপ থেকে এঁরা দুজনে কল্পনায় যে মশাল জ্বালিয়েছিলেন, তাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার পরিবর্তে এঁরা এবং পরবর্তী লেখকরা দেশপ্রেমকে নিয়ে গেলেন মূলত জেমস টডের পূর্বে উল্লিখিত বইটি[১৩৭] অবলম্বন করে রাজপুত ইতিহাসের নিরাপদ অতীতলোকে। ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামের অপ্রিয় প্রসঙ্গ যখনই এসে পড়েছে নিতান্তই, তখনই বঙ্কিমচন্দ্র থেকে সবাই-ই শেষ পর্যন্ত ইংরেজ শাসনের মঙ্গলাত্মক দিকটির কথাই উল্লেখ করেছেন সাড়ম্বরে,[১৩৮] অমঙ্গলাত্মক বৃহত্তর দিকটিকে এড়িয়ে এসেছেন ঐ মধ্য-

বিত্ত-সুলভ সতর্ক বুর্জোয়া-চরিত্র-কারণে। সমাজ নিয়ে রিফর্মেশন-এর কথাই অল্পবিস্তর সবাই বলেছেন, স্বদেশ নিয়ে রেভোল্যুশনের কথাকে এড়িয়ে। তাই ডিরোজিওর সামগ্রিক উত্তরাধিকার উনিশ শতকের অন্যান্য প্রধান পুরুষদের ওপর বর্তায় নি।

'সতী'-প্রথা রদের সূত্র ধরে এসেছে বিধবাবিবাহ আইন ; কৌলীন্যপ্রথা এবং বাল্যবিবাহের রেওয়াজ পরিবর্তনশীল অর্থনীতিতে আপনিই ক্ষীণজীবী হয়ে গেছে ; স্বদেশপ্রেম অর্থান্তরে হয়ে দাঁড়িয়েছে নিবেদন-আবেদনের রাজনীতি এবং নিরাপদ অতীতচারণ আর নতুনভাবে হিন্দুয়ানীর পুনরুজ্জীবন ঘটেছে সমস্ত সংস্কার-আন্দোলনের ভিত্তি আল্‌গা করে দিয়ে।[১৩৯] স্বভাবতই ডিরোজিওকে আমরা ধীরে ধীরে মন থেকে সরিয়ে দিয়েছি এই সব কিছুর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে। তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন আমরা করবার চেষ্টা না করেই নতুন শতাব্দীতে পদক্ষেপ করে আধুনিকতর জীবন-সমস্যার উত্তরোত্তর সম্মুখীন হয়ে এক সময়ে তাঁকে ভুলে গেছি কখন তা আমরাই জানি না !

ডিরোজিওর শিষ্যদের তারুণ্যের চপলতাই আমাদের কাছে ইঅং বেঙ্গলের মুখ্যতম পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মধুসূদনের নবকুমার[১৪০] কিংবা দীনবন্ধুর নিমচাঁদ্ বা অটল[১৪১] যে যথার্থ ইঅং বেঙ্গল নয়, সে কথা শুধুমাত্র শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বইয়ের মধ্যেই বন্দী হয়েছিল। যে সামাজিক বামপন্থার অংকুর দেখা দিয়েছিল ডিরোজিওর নেতৃত্বে তাকে বাঁচিয়ে রাখার মতো পরবর্তী নেতৃত্ব দেখা দেয়নি। তাই এটা কিছু বিস্ময়ের কথা নয় যে, এই দেড়শ বছর পরে এদেশে এখন যখন বামপন্থী চেতনা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখনই নতুন ভাবে আবার ডিরোজিওর প্রতিষ্ঠা এবং মূল্যায়নের কথা ভাবা হচ্ছে।[১৪২] যে অগ্রসরণ কয়েক প্রজন্ম আগেই স্তব্ধ হয়ে গেছে, আজকে নতুন করে তার উত্তরাধিকার অর্জনের মধ্যেই মিলবে আমাদের যথার্থ রেনেসাঁসের ঠিকানা। এ দেশের ইতিহাসে তা এখনো অনাগত ॥

তথ্যসূত্র

ও

প্রাসঙ্গিকী

১. ড্রামণ্ড সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্যের জন্য 'The Oriental Magazine' পত্রিকার ১৮৪৩ সালের বিভিন্ন সংখ্যা দ্রষ্টব্য।
২. 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়' [১৯৫২] : হরিহর শেঠ ; পৃ. ৭৮।
৩. 'India Gazette', 25th. December, 1822.
৪. 'India Gazette', 22nd. January, 1824.
৫. 'Memoirs of William Hickey' [Edited by A. Spencer, 1948], Vol. 4. pp. 41-3.
৬. 'The Modern British Poets', 'Calcutta Literary Gazette,' 10th. October, 1833.
৭. হিউম সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধার পরিচয় পাই এইচ. এইচ. উইলসনকে ২৬ এপ্রিল, ১৮৩১ তারিখে লেখা চিঠিতে ['Pomes of H. L. V. Derozio' (1923), Edited by F. B. Bradley-Birt ; pp. xlvii,] ; বেকন প্রসঙ্গে ঐ চিঠিটি এবং তাঁর 'অন দি ফিলজফি অব বেকন' ['Calcutta Gazette', 21st. August, 1829] সনেটটি স্মর্তব্য ; মোপার্তুইয়ের একটি দর্শন-চিন্তা-মণ্ডিত প্রবন্ধ তিনি অনুবাদ করেছিলেন 'অন মর‍্যাল ফিলজফি' ['Calcutta Quarterly Review' (1833)] নামে ; কাণ্টের দর্শন সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ এবং কঠোর একটি সমালোচনাত্মক নিবন্ধ লিখেছিলেন ডিরোজিও, যা সে আমলে সুধীমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জনও করেছিল ['English Poetry in India' (1869), Edited by T. B. Laurence. Vol. 1. pp. 99].
৮. হিন্দু কলেজে ডিরোজিও পড়াতেন এই বইগুলি :

Goldsmith's History of Greece, Rome & England ; Russell's 'Modern Europe'; Robertson's 'Charles V' ; Gay's 'Fables' ; Pope's 'Homer's Illiad & Odyssey' ; Dryden's 'Virgil' ; Milton's 'Paradise Lost' ; Shakespeare's one of the 'Tragedies'. ['Henry Derozio, The Eurasian Poet, Teacher & Journalist' (1884) : T. Edwards ; pp. 66].

৯. 'The Fakeer of Jungheera' ; Notes on Canto I/Seetion 3/Lines 1-2.

১০. এই কবিতাটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদ করেছিলেন : "স্বদেশ আমার কি বা জ্যোতির মণ্ডলী" ইত্যাদি।

১১. 'Jungheera' ; II/3/1-12.

১২. do ; notes on I/21/9-12.

১৩. do ; I/19

১৪. do ; I/9/1-6.

১৫. do ; I/2/1-6,

১৬. 'ঋগ্বেদ', ; ১।৫০।৮-৯।

১৭. 'Jungheera' ; I/6/40 & notes.

১৮. 'ঋগ্বেদ' ; ১।৩৫।২-১১, ১০-৩৭।১-১২।

১৯. 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ' ; ১।৩।১-১৮, জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ। 'ছান্দোগ্য উপনিষদ' ; শ্বেতকেতু উপাখ্যান।

২০. 'ঋগ্বেদ' ; ১।৩৫।২-১৫, ৬।৭১।১৩, ৭।১, ৭।৪৫।

২১. ঐ ; ১।১৯১।৭-১২।

২২, ঐ ; যথাক্রমে, ১।২২।৫-৮, ১।১১৫।৪, ৪।৪৬।৬, ১।১৬৪।৫২, ৫।৪১।২, ৫।৮২।১-৬, ৭।৭৩।১-৪ ইত্যাদি।

২৩. ঐ ; ৭।৬৩।৪।

২৪. 'Jungheera' ; notes on I/19/15-16.

২৫. 'ঋগ্বেদ,' ১০।৯০।

২৬. বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্য থেকে জোন্সের করা অনুবাদের তালিকা : 'Extract from a Disssertation of the Primitive Hindus' ; 'The Gaytria, or Holiest Verse of the Vedas' ; 'Isavasyam, or an Upanishad from Yajur Veda' ; 'From the Yajur Veda [Hymn]' ; 'A Hymn to Night.'

জোন্সের স্বরচিত 'হিন্দু' স্তোত্রগুলির তালিকা :

Hymns to : 'Durga,' 'Bhabani', 'Indra', 'Surya', 'Lakshmi', 'Narayana', 'Saraswaty,' 'Ganga'.

২৭, ক, 'Oupnekhat ou Theologia et Philosophia' [1801 2, Vols. 1-2] : A. Duperron.

খ, 'On the Vedas or Sacred Writings of the Hindus' : H. T. Colebrooke ['Asiatic Researches', 1805]

গ, রামমোহনের বৈদিক-সাহিত্য-চর্চার তালিকা :

বাংলা : 'বেদান্ত গ্রন্থ' [১৮১৫], 'বেদান্তসার' [ঐ]' 'তলবকার উপনিষৎ' [১৮১৬], 'ঈশোপনিষৎ' [ঐ], 'কঠোপনিষৎ' [১৮১৭], 'মাণ্ডুক্যোপনিষৎ [ঐ], 'মণ্ডুকোপনিষৎ' [১৯১৯]।

ইংরেজী : 'Vedant, or the Resolution of all the Veds' [1816], [German & Hindi Versions (1817)], 'Cena Upanishad' [1816], 'Ishopanishad' [do], 'Moondak Upanshad' [1819],' Kuthopunishad [do].

২৮. 'Rig-Veda-Samhita' [1850-18. Vols. 1-6] : H. H. Wilson.

২৯. 'Rig-Veda' [1875] : K. M. Banerjea.

৩০. 'Jungheera, ; Notes on II/5.

৩১. Jungheera' ; I/27/Last six lines.

৩২. do ; I/24.

৩৩. do ; I/6.

৩৪. do ; II/2/1-6, 31-42.

৩৫. 'মেঘনাদবধ কাব্য' [১৮৬১] : মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ২।৩৭-৪৬।

৩৬. 'Jungheera' ; II/10/4.

৩৭. do : II/13/3

৩৮. do ; II/5/4/1-4 ['The Spirit's Song']

৩৯. 'Enchahtress of the Cave' ; Stanza 1/Line 1,

৪০. do ; 2/13-14

৪১. do ; 4/3, 7/18, 8/15, 13/5, respectively.

৪২. do ; Notes A to F, respectively.

৪৩. '....it bids me sadly call to mind.

The sacred city, standing to its marge,
Where all I ever know of Rome is fixed"

৪৪. ভারত-প্রবাসী ইংরেজ কবিদের মধ্যে কেবল এইচ. এম. পার্কারই ডিরোজিওকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিলেন। শুধু এই কবিতাতে নয়, 'জঙ্গীরা'-র শেষ অংশে পার্কারের 'ড্রুট অব ইমর্টালিটি' [১৮২৭] কাব্যের দুটি ছত্রের তুলনা করেছেন তিনি স্বকৃত টীকায়। পার্কারের আদর্শে শেকসপীআরীয়-বিষয় নিয়ে লেখা সনেট দুটি এবং তাঁর উদ্দেশে নিবেদিত সনেটটির কথাও স্মর্তব্য।

৪৫. 'Jungheera' ; Notes on I/10/17-18, I/21/9-12

৪৬. সনেটটির উপলক্ষ ছিল ডেভিড হেআরের একটি তৈলচিত্র স্থাপন করার জন্য জনৈক ভদ্রলোকের একটি প্রস্তাব।

৪৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'তীর্থরেণু' [১৯১০] বইতে 'বালবিধবা' নামক কবিতাটির একটি অনুবাদ সংকলিত হয়েছে।

৪৮. 'History of British India' [1824] : J. Mill.

৪৯. 'History of Hindostan' [1763-72 ; Vols 1-3] : A. Dow.

৫০. 'Cansiderations on India Affairs' [1772] : W. B. Merchant.

৫১. 'Annals & Antiquites of Rajasthan' [1829-30, Vols-1-2] : J. Tod.

৫২. 'Henry Derozio' [1884] : T. Edwards, pp. 66.

৫৩. 'The Greeks, and What We Have Received from Them' ['Calcutta Literary Gazette', 3rd. Jannary, 1835]

৫৪. "It should be an Aegean isle
Where heaven and earth and ocean smile.'

৫৫. 'উপক্রম' [২] ['চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৫) : মাইকেল মধুসূদন]।

৫৬. ঐ এবং 'কবি দান্তে' [ঐ]।

৫৭. 'ডিরোজিও' পদবী সচরাচর পর্তুগীজদের মধ্যেই পাওয়া যায় ; তবে জনৈক গবেষকের মতে :

'Both his perents were of this country, but his father appear to have been of Italian descent." 'English Poetry in India' [1859 ; Vol. 1] : T. B. Laurence ; pp. 98.

৫৮. 'Jungheera' ; Notes on 11/4/6-10.

৫৯. "Come hither boy ! fill up my cup —" 'Here's health to thee, Lassle !'
মূল 'রুবাইআৎ-ই-ওমর খৈআম'-এ সাকী হল বালক ; স্পষ্টতই ডিরোজিও মূলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে ডিরোজিও ঠিক সমানবয়স্ক ফিট্‌জেরালড তাঁর অনুবাদের কারিকুরিতে সাকীকে বালিকায় পরিণত করেছেন !

৬০. মৃত্যুর কিছু আগে ডিরোজিও তাঁর অন্যতম প্রিয় কবি ক্যামবেলের 'প্লেজার্স অব হোপ' কবিতাটি শুনতে চাইলে তাঁর জনৈক ছাত্র আবৃত্তি করে শোনান সেটি ['Henry Derozio', (1884) : T. Edwards, pp. 167.].

৬১. 'Calcutta Literary Gazette', 3rd. Jannary, 1835.

৬২. 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' [৪র্থ সং, ১৯২৫] : যোগীন্দ্রনাথ বসু ; পৃ. ১১২-১১৩।

৬৩. 'English Poetry in India' (1869, Vol. 1) T. B. Laurence', pp. 104-5.

৬৪. উদ্ধরণ-চিহ্নের মধ্যে বিধৃত রূপকল্পগুলি, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের করা অনুবাদ 'বৌ-দিদি' ['তীর্থরেণু' ১৯১০] থেকে নেওয়া।

৬৫. 'Henry Derozio' (1884) : T. Edwards ; pp. 24-25

৬৬. 'India Gazette' ; [1825, different issues]

৬৭. do ; [1826, do].

৬৮. 'India Gazette' ; [1825, last issue of February].

৬৯. 'The Orient Pearl' [1832].

৭০. 'Bengal Annual & Literary Keepsake' [1830].

১১. 'The Calcutta Monthly Journal', January, 1825-সংখ্যায় এই চিঠি এবং প্রাসঙ্গিক কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে।

১২. 'The Calcutta Literary Gazette,' 14th. October, 1833; এই লেখাটি অপ্রাপ্ত।

জুলাই ও আগস্ট মাসের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৪. 'The Calcutta Literary Gazette,' 3rd. January, 1835, সংখ্যায় এই সমস্ত নিবন্ধিকাগুলি সংকলিত হয়েছে।

১৫. 'The Calcutta Quarterly Megazine & Review', July, 1833; pp. 519-24.

১৬. এই লেখাটি আদৌ মুদ্রিত হয়েছিল কি না, তা জানা যায় না।

১৭. যেমন সতীদাহ-সম্পর্কিত টীকাটি উদাহরণ হিসেবে মনে করা যায় 'The Fakeer of Jungheera'-র, X/17-18 পংক্তি প্রসঙ্গে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত 'Bengal : Early Nineteenth Century [Selected Documents], গ্রন্থে 'Kaleidoscope,' Sept., 1829-এর সংখ্যায় প্রকাশিত 'On the Colonization of India by Europeans' শিরোনামের একটি প্রবন্ধকে ঐ গ্রন্থের ভূমিকায়, ডিরোজিওর লেখা বলে সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হল যে, প্রবন্ধটি যেহেতু **অস্বাক্ষরিত,** তাই সেটিকে স্বয়ং সম্পাদকেরই [তাঁর তথ্য অনুযায়ী ডিরোজিওর] লেখা বলে গণ্য করতে হবে। এই সূত্র ধরে শ্রীচট্টোপাধ্যায় ডিরোজিওর স্বদেশচেতনার বিষয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু লেখাটি ঐ বইতে যেখানে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছে, সেখানে লেখার শেষে একটি **স্বল্প-স্বাক্ষর** সন্নিবিষ্ট দেখা যাচ্ছে: 'S. J'; ডিরোজিওকে এই স্বাক্ষরের সঙ্গে মেলানো সুদূরান্বয়ী। অর্থাৎ ভূমিকার বক্তব্য-অনুযায়ী সিদ্ধান্ত [লেখাটি অস্বাক্ষরিত] সঠিক নয় এবং যে স্বল্প-স্বাক্ষর যেখানে আছে, তাও ডিরোজিওর হবার স্বপক্ষে প্রমাণ দেখা যাচ্ছে না। ইংরেজ শাসনের সুফল-কীর্তি বর্ণনামূলক ঐ নিবন্ধ তাঁর নিজের মতানুসারী—এমন ভাবারও যুক্তি নেই; তাঁর মনের মধ্যে যে উদার গণতান্ত্রিকতার পরিচয়

ড. উইলসনকে লেখা চিঠি, গদ্য এবং কবিতার বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায়, তার থেকে এটা মেনে নেওয়া চলে যে, বিরোধী বক্তব্যকেও পত্রিকার পাতায় ঠাঁই দেবার মতো ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিল।

৭৮. 'Human Action', H. L. V. Derozio; 'The Calcutta Literary Gazette', 3rd. January, 1835; পরে দ্রষ্টব্য।

৭৯. 'Conclusion of My Address to My Students &c.'; do.

৮০. 'Acknowledgement of Errors'; do.

৮১. 'Poetical Works of H. L. V. Derozio' Vol. I: [Ed.], B. B. Shah [1907], Introduction by E. W. Madge, Pp iv.

৮২. 'A History of Philosophy', Part II : B. A. G. Fuller; [1935] Pp. 197.

৮৩. 'সংবাদ রত্নাকর', ৭ জানুয়ারী, ১৮৩২; 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', [২য় সংস্করণ, ১৯৪১], ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত; পৃ. ৩৩।

৮৪. 'বেঙ্গল স্পেকটেটর', ১ সেপ্টেম্বর, ১৮৪২; 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ঐ, পৃ. ৭১৪-'১৫।

৮৫. 'Poetical Works &c.' B. B. Shah [Ed.]; Introduction, Pp. vi-vii.

৮৬. প্রচলিত জীবনী অনুযায়ী ঐ তারিখ ১৮৩৭: কিন্তু পরবর্তী সময়ে সংবাদপত্র-নির্ভর তথ্যানুসারে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ তারিখ ১৮৩৪ বলে নির্দিষ্ট করেছেন। 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'র মাইকেল-জীবনী দ্রষ্টব্য।

৮৭. হোরেস হেম্যান উইলসনকে ২৬.৪.১৮৩১ তারিখে লেখা ডিরোজিওর একটি পত্রে হিউম এবং বেকন সম্বন্ধে তাঁর যথার্থ মনোভাবের প্রকাশ দেখি: 'Poems of H. L. V. Derozio': F. B. Bradley-Birt (Ed.): 1923, Pp. xlvii। বেকন সম্বন্ধে তাঁর একটি কবিতাও আছে, 'On the Philosophy of Bacon', 'Calcutta Gazette', 21. 8. 1829.; লক-সম্পর্কিত তাঁর প্রবন্ধটিও এখানে উল্লেখনীয়, 'Lock's Style & Reasoning' [The Calcutta Literary Gazette,' 3. 1. 1835]; পরে দ্রষ্টব্য।

৮৮. কাণ্ট-সম্বন্ধে তাঁর একটি বহু-প্রশংসিত গবেষণার উল্লেখ ইতিপূর্বেই করেছি : 'Objections to the Philosophy of Emanuel Kant' ['English Poetry in India', T. B. Laurence, (Ed.) : Vol. I, 1869 ; Pp. 99]

৮৯. বিবর্তনবাদী খ্রিষ্টানচেতনার প্রথম যুগের দার্শনিকদের অন্যতম পিএর লুই মোরে দ্য মোপাতুইয়ের একটি দীর্ঘ গবেষণার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেছিলেন ডিরোজিও 'On Moral Philosophy' ['The Calcutta Quarterly Magazine & Review,' 1833 ; Pp. 519-24] ; এটিও আগে উল্লেখিত হয়েছে। লেখাটি পরে দ্রষ্টব্য।

৯০. ডিরোজিও-পন্থীদের 'সোসাইটি ফর অ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ'-এর ১৩.২.১৮৪৩ তারিখের সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন ভারতে বৃটিশ শাসনের কঠোর সমালোচনা করলে, শ্রোতৃমণ্ডলী থেকে রিচার্ডসন তার তীব্র প্রতিবাদ জানান। সভাপতি হিসেবে তারাচাঁদ রিচার্ডসনকে তিরস্কার করেন। এই রাজনৈতিক বিতণ্ডার জের বহুদূর গড়ায়। পক্ষান্তরে, ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদেরকে রাজনীতির আলোচনায় কি পরিমাণে উৎসাহিত করে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন, তার হদিশ প্রেসিডেন্সী কলেজ গ্রন্থাগারে রাখা হিন্দু কলেজের অপ্রকাশিত নথিপত্র ঘাঁটলেই মিলবে।

৯১. ১৮৫৩ সালের জানুআরীতে হীরার পুত্র হিন্দু কলেজে ভর্তি হলে এই 'অনাচারে'র প্রতিবাদে রক্ষণশীল হিন্দুরা পাল্টা প্রতিষ্ঠান তৈরী করলেন হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ। রিচার্ডসন অচিরেই তার অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করলেন।

৯২. মাইকেলের "I sigh for Albion's distant shore……" ইত্যাদি কবিতা স্মরণযোগ্য।

৯৩. "My Fond Sweet Blue-Eyed Maid." ইত্যাদি কবিতা দ্রষ্টব্য।

৯৪. "গৃহিণী॥ ঐ যে রামমোহন রায়—না—কার কি সভা আছে—", 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ২/২

৯৫ 'রাজনারায়ণ বসুকে লেখা পত্রে হরিশ সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল দু-একটি কথা দেখি। 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' : যোগীন্দ্রনাথ বসু ; ৪র্থ স, ১৯২৫ ; পৃ. ৪৮৪, ४৯০ দ্রষ্টব্য।

৯৬. গৌরদাসকে ১৪. ২. ১৮৪৯ তারিখে লেখা চিঠি দ্রষ্টব্য।

৯৭. ঐ, ১৮. ৮. ১৮৪৯।

৯৮. 'The Anglo-Saxon & the Hindoo' [1854] দ্রষ্টব্য।

৯৯. ঐ।

১০০. 'The Visions of the Past' [1849].

১০১. 'The Captive Ladie' [1849]; 'Rezia, the Empress Inde' [1850]

১০২. 'King Porus', 'The Calcutta Literary Gleaner,' July, 1843.

১০৩. 'চতুষ্কোণ' পত্রিকার ১৩৮০ সালের বৈশাখ সংখ্যায় তপোবিজয় ঘোষ এবং আষাঢ় সংখ্যায় সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী সন্দেহাতীতভাবে এ কথা প্রমাণ করেছেন যে 'নীলদর্পণ' মধুসূদন অনুবাদ করেন নি।

১০৪ 'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পনখা', 'বীরাঙ্গনা কাব্য,' ১৮৬২।

১০৫. 'সোমের প্রতি তারা', ঐ।

১০৬. 'মেঘনাদবধ কাব্য', ১৮৬১, নবম সর্গ।

১০৭. 'On the Abolition of the Sattee', December, 1829; 'Poetical Works of H. L. V. Derozio': B. B. Shah (Ed.)

১০৮. 'The Fakeer of Jungheera.'

১০৯. "...faithless Seeta hath deserted the arms of her exile husband, and brought desolutions and disaster and woe to the spicy and pearly shores of Lunka!" ['The Anglo-Saxon etc.' op cit.]

১১০. "যে পীড়া ধনুক ধরি হেন বাণ হানে/রাক্ষসের রূপ ধরি, বুঝিতে কি পার/বিদীর্ণ বঙ্গের হিয়া যে নিষ্ঠুর বাণে?..." [পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', 'মধুসূদন রচনাবলী', সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, ১৯৬৫; পৃ. ১৯৬].

১১১ "...I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done."—রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠির অংশ; যোগীন্দ্রনাথ বসু, পূর্ববৎ; পৃ. ৩২৭।

১১২. যথা : "···বৃথা আশা! পূর্বজন্মফলে/হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে!" 'মেঘনাদবধ কাব্য', নবম সর্গ।

১১৩. 'মধুস্মৃতি', নগেন্দ্রনাথ সোম, ২য় সং, ১৯৫৪, পৃ. ৩০৯।

১১৪. 'ভিক্টর হুগো', 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী', ১৮৬৫।

১১৫. 'Sonnet to the Pupils of the Hindu College'; F. B. Bradley-Birt [op. cit.]

১১৬. 'Sonnet, written at the Hindu College', নগেন্দ্রনাথ সোম, পূর্ববৎ।

১১৭. 'King Porus', M. S. Datta; 'Calcutta Literary Gleaner', May, 1843.

১১৮. 'Independence', H. L. V. Derozio; 'The Orient Pearl', 1832.

১১৯. 'Preface', 'The Persecuted', K. M. Banerjea, 1831.

১২০. 'Dedication', 'The Persecuted'; 12. 11. 1831.

১২১. "Bear in mind my friends when I have lost my father, my mother, my brothers, my sisters for this monster superstition···" ('Preface', 'The Persecuted'); এই নাট্য-চিত্রের নায়ক বেণীলালের মতো কৃষ্ণমোহনকেও বিতাড়িত হতে হয়েছিল বাড়ি থেকে সমাজপতিদের চক্রান্তে।

১২২. বস্তুতপক্ষে এই রকম একটি 'নিষিদ্ধ' পানভোজনের ঘটনার সূত্র ধরেই কৃষ্ণমোহনকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত হতে হয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' [১৯৭৭ সং., পৃ. ১০৬-৭] দ্রষ্টব্য।

১২৩. 'জীবন' অধ্যায়ের ৬-৭ পৃষ্ঠা পুনর্দ্রষ্টব্য।

১২৪. 'রামতনু লাহিড়ী ইত্যাদি'; পূর্ববৎ।

১২৫. ঐ; পৃ. ১৪৪।

১২৬. 'Hindu Intelligencer' পত্রিকার পাতায় তাঁর নানা ধরণের রক্ষণশীল এবং পশ্চাদমুখী মনোভাবের পরিচয় দেখি। স্ত্রীশিক্ষার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন কাশীপ্রসাদ। 'ইঅং বেঙ্গল' সম্বন্ধেও তাঁর মন প্রতিকূল ছিল; 'The Hindu Intelligencer', 8. 10. 1849 দ্রষ্টব্য।

১২৭. 'The Shair and Other Poems,' 1830 : K. P. Ghosh ; Pp. 183 ; কবিতাটি লেখা হয় ১৮২৮-এর ফেব্রুআরিতে, অর্থাৎ ডিরোজিওর 'The Harp of India' প্রকাশিত হবার পরের বছর এবং 'To India—My Native Land' প্রকাশিত হবার বছরেই।

১২৮. 'The Shair &c' ; ক. Canto I / Section IX এবং খ. Canto III / Final Section.

১২৯. 'School Hours, or the Poems Composed at the School', 1838 : Gooroo Churn Dutt ; 'Introductory Lines.'

১৩০. কৈলাস ছিলেন ডিরোজিওর বিতাড়নকালে হিন্দু কলেজের যিনি সম্পাদক ছিলেন, সেই রসময় দত্তের পুত্র এবং বিখ্যাত তরু দত্তের জ্যেঠা-মহাশয়। শশী নিজে বড় ঐতিহাসিক ছিলেন ; তিনি রমেশচন্দ্র দত্তের কাকা। দু'জনেই রিচার্ডসনের ছাত্র। শশীর সহপাঠী ছিলেন মধুসূদন।

১৩১. 'A Journal of Forty-Eight Hours of the Year 1945' : Kylash Chunder Dutt ; 'The Calcutta Literary Gazette', 6. 6. 1835.

১৩২. do.

১৩৩. এই লেখাদুটি সম্পর্কে এবং সামগ্রিকভাবে ইংরেজি সাহিত্যে ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের কি ছবি পাওয়া যায়, সে বিষয়ে বর্তমান লেখকের 'উনিশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যে বিপ্লবী ভারতের চিত্রকল্প'[সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৭৬] বইটি প্রাসঙ্গিকভাবে দেখা যেতে পারে।

১৩৪. 'The Calcutta Courier', 10. 6. 1835 এবং 'The Calcutta Literary Gazette,' 17.6.1835 দ্রষ্টব্য।

১৩৫. কৈলাস কটকে উপ-জেলা সমাহর্তা হয়েছিলেন এবং শশী রায়বাহাদুর খেতাব পান।

১৩৬. 'Shunker : A Tale of the Mutiny' : Shoshee Chunder Dutt, 1875.

১৩৭. ৫১ সংখ্যক টীকা পুনর্দ্রষ্টব্য।

১৩৮. 'প্রাসঙ্গিকভাবে 'আনন্দমঠ' [১৮৮২], এবং 'দেবী চৌধুরাণী' [১৮৮৪] বইদুটির শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

১৩৯. এইসব প্রসঙ্গে সুন্দর আলোচনা করেছেন, 'উনবিংশ শতাব্দীর স্বরূপ' বইতে [১৯৬৯] বিনয়কৃষ্ণ দত্ত।

১৪০ 'একেই কি বলে সভ্যতা', ১৮৬০।

১৪১. 'সধবার একাদশী', ১৮৬৬।

১৪২. ডিরোজিওর স্মৃতিচর্যার একটি ধারাবাহিক এবং তথ্য-নির্ভর বিবরণের জন্য 'পরিশিষ্ট ঃ দুই' দ্রষ্টব্য।

নির্বাচিত নিবন্ধ

THOUGHTS ON VARIOUS SUBJECTS

Acknowledgement of Errors: It has been frequently maintained, the parents and instructors should behave in such a manner towards children as to lead them to suppose that they are infallible. This is very generally practised and there are few boys who do not think that their masters are the most perfect and accomplished personages in the world. This is fraught with mischief, and should be discouraged. It makes boys take opinions upon trust—the cause of all the prejudices and errors that exist.

I, this day, [19th. Oct., 1829], most rashly, told one of my students that I disbelieved him—a circumstance which has given me much sorrow. It appeared afterwards that I was mistaken: and I confessed my indiscretion before the whole class.

Who censures me for this, and tells me that I gave the boy an opportunity to triumph?—I reply, that it was the least I could have done, after having hurt his feelings, and wounded his honour. Price and pedantic authority might have directed the adoptation of another course; but *justice* required that even a man should have made due reparation to a child whom he had offended.

Definitions: In his introductory "Essay on Taste" affixed to the "Enquiry into the Origin the Sublime and Beautiful," Burke remarks that a definition should *conclude* our observations. This certainly seems to be the natural order of things, and it is fraught with important advantages. The method of instruction should be followed in writing and teaching, as closely as in discovery; for, as it becomes familiar to readers and students, it wiil become a *habit* and set them about thinking and discovering.

Titles: 28th. October, 1829—In one of the morning papers, I this day met with the name of Mr. Owen of Lanark.

He was mentioned as *Owen the Philanthropist.* I felt a strange sensation—my eyes swam in tears, and my mind was filled with high thoughts and higher longings. "Owen, the philanthropist :"—How poor after that title are the designations of peer, prince, king, or emperor ! And yet it has been an object of ambition to few. It is a title which all may gain, without incurring the least odium, and still it is rarely sought. The path to a crown is frequently murderous and bloody ; but he who strives to attain the name and character of a *philanthropist* establishes his claim by means which benefit mankind.

Locke's Style and Reasoning : 4th. December, 1829. One of my pupils, about fifteen years old, whose acquaintance with the English language commenced about two years ago, made a remark yesterday concerning Locke with which I was struck. I had been just reading to him and to some others a part of the 'Essay on the Understanding,' when he remarked, with reference to Locke's style of writing and the excellence of his reasoning, that *he seemed to have had the tongue of a child of five years old in the head of a man of a hundred.* I never heard anything better said of Locke. The boy's name deserves to be mentioned—it was Ramgopal Ghose

Human Action : 1st. February, 1830—The acts of a moral and intellectual agent are to be distinguished from the movements of brute matter, in so far as the former are uniformly the result of *thought*, the latter *of material contact.* The movements of stone are caused by impulse, *human action is the embodying of human thought.* All action that does not originate in thought, momentary or profound, is like the action of inanimate matter. It is occassioned by an external or accidental impulse. Hence arise various evils. Would men embody their thoughts, that is, act according to their principles, we should see less evil than at present exists.

The Greeks, and what we have received from them : 16th. May, 1830—Under the general names of Greece and the

Greeks we include that portion of country and its inhabitants bounded on the east by the Ionian, onthe west by the Aegean, on the south by the Mediterranean, and on the north by Macedonian. We are also too apt to suppose that the inhabitants of this country have altogether benefitted the world and are entitled to the immortal name they have acquired. But the obligations of posterity to the Greeks are limited entirely to the Athenians. The arts and sciences were not cultivated in Laconia, Thesalia, Aracadia, and Etoka. The Arcadians were indeed inferior to the Lacedemonians and Etolians, but they never rose beyond their vagrant postoral life ; and although Polybins and a few other Arcadians have shone in literature, yet it will be remembered that this was not till Epaminondas had founded a metropolis in that country, to which the shepherds reluctantly resorted in consequence of the incursions of the Lacedemonians. Mr. De Pallw informs us that Argos, Corinth, Sicyon, Rhodes, Argina, and some other islands of the Archipelago cultivated the arts of sculpture and painting with some degree of success ; but Athens alone succeded in establishing permanent schools of Philosophy and in carrying knowledge up to an astonishing eminence. But how has it happened that the glory so justly due to that republic has been diffused among the other states of Greece ? This circumstance—may be satisfactorily accounted for, when we take into consideration the influence of *casual associations.* The Athenians, Spartans, Artolians, Thessalians, and Aracadians were all *Greeks* ; hence the name of Greek has become associated with the glory and greatness of one class of men who bore that name ; and the glory and greatness having been transferred to the general name has been applied to each particular specis of Greeks.

If the solution of this problem be correct, it strongly indicates the extent to which the arts and sciences of civilized life confer glory and immortality ; for they have not only the effect of perpetuating the name of the nations or indivi-

duals by whom they have been successfully cultivated, but of imparting a portion of the light they shed upon their memories to all circumstances, and things, with which those nations or men have been in any degree connected.

Conclusion of My Address to My Students Before the Grand Vacation in 1829 : As your knowledge increases, your moral principles will be fortified ; and rectitude of conduct will ensure happiness. My advice to you is, that you go forth into the world strong in wisdom and in worth ; scatter the seeds of love among mankind, seek the peace of your fellow creatures, for in their peace you will have peace yourselves.

EDUCATION IN INDIA

It has often been regretted that "Education in India" is not better than it is at present. But while most people who are at all interested in a matter of such importance have lamented the cause, and still do so, yet, it is no less true that but few indeed have attempted to remedy the evil. To these few, however, the thanks of the community are due ; but it is painful to observe, that those who would benefiit most by their laudable endeavours, are least forward in affording them that support, which can alone ensure success This assertion is not a hazarded one. I do not speak on supposition, but "facts are stubborn things," and they will bear me out in what I say.

Who that has been in the habit of looking about the schools in Calcutta, and enquiring what improvement is made by youth in this country both in a moral and an intellectual view—who, I ask, is there, that will deny that Education in India is in a very backward state ? I am aware that within late years several efforts have been made by those to whose care Education is entrusted, to effect great improvements. But their single exertions for want of support have either dwindled away into nothing or produced but slight effects.

Now, although the subject before me is, and must be interesting to all men who have the well-being of their fellow creatures at heart, yet its *locality* gives it a particular claim to the consideration of our *East Indian Community*,—a body whose numbers are daily increasing and whose duty should be to study its own welfare. To study its own welfare should be the duty of every collective body ; but it is lamentable to observe that in the one I have named there appears to be the want of a right feeling among the members that compose it. This feeling is unanimity. They are a body, and yet they are *not* a body. This involves a paradox.

But it is cleared up when we remark that they are body in as much as they do not seem to belong to each other. Most of them, at least the better portion, are anxious for their weal, but each individual is as anxious to effect this in his own way. One will not concede to other. Everyman is jealous of his neighbour, although every man would be glad to ameliorate the condition of his countrymen. If one should have a plan to propose, another immediately starts with what he thinks more beneficial, so that this unworthy perseverance in not giving way to the opinions of each is utterly detrimental to their best interests. Let them *unite*, let them bring themselves together, form associations and societies, learn the sentiments of each other, find out their own value, and ascertain what they are capable of effecting, *then*, and not till then, will they be enabled to improve their condition. There was the *East Indian Dinner Club*, but it fell. And what was the cause of this ? Nothing less than that baneful want of unison in feeling. But there remains the *Oriental Literary Society*. This Institution has, through the perseverance of some of its members, existed for upwards of a twelve month ; and though novelty no longer gives it a charm, I am glad to say that the unwearied exertions of those who have enlisted in the good cause have been abunduntly successful. But this success has been owing only to the perseverance of *very few*. The majority of the East Indian Community has no claim to the benefits which have resulted from this Institution.

In an able article in the 4th. number of the *Indian Magazine*, are shown the necessity and benefit of Local Education. But the writer has [and it is to be regretted] not been so candid as might be wished, since he has omitted mentioning the Calcutta Grammar School with the Parental Academic Institution. It will be remembered that the former, as well as the latter, was planned for the instruction of Indo-British youth and with the view [as I think] of obviating the necessity of a European Education. In other respects

the subject of Local Education. In other respects the subject of Local Education has been very dispassionately and ably treated by the writer of that article; although I think [considering the present state of Education in India] that an appeal to East Indians to discontinue the practice of sending their children to England for instructions, is wholly useless, until Education here assumes that tone which will preclude the necessity of adopting the usual method. I mean, that of sending children to England. No parent [how patriotic so ever he might be] would educate his children in India merely to try the experiment of improving the tone of education here thereby. Such is not to be expected. The man who has the welfare of his countrymen at his heart will endeavour to raise funds for their improvement, establish institutions for the same purpose, but not till these are effaced will he risk the welfare of his child by educating him in his native country, while the advantages to be derived from foreign education are so very superior. I was born in India and have been bred here; I am proud to acknowledge my country, and to do my best in her service, but even love of country shall not hinder me from expressing what I believe to be right. I have a brother in Scotland, where he is to study a profession, which here he could never learn. Would it not have been injustice to have detained him here, and then to say to him at a future period, "you might have been doing well in the world, but you are educated in India from a patriotic motive?" It would be absurd to hold such language, and unjust to adopt such a measure. This subject requires much time and space, neither of which can be now afforded to it—besides I have mentioned my brother, and I can never think of him and anything else at the same time. My pen is also burdensome, and I think the Muse is come to pay me a visit. She is most welcome, I shall take advantage of her favour, and dedicate the following lines :

To My Brother in Scotland

O'er the blue, boundless, watery waste
To that far land where now thou art,
Be many a blessing borne to thee
By guardian seraphs of the heart !
Yes—o'er the wide eternal sea
Be many a blessing born to thee !

Thy glance is gay, thy smiles are bright,
Thy every youthful word is glad,
And Oh ! Thy little heart is light
As if the heart may ne'er be sad ; —
Thy life is sunshine, mirth and joy—
So be it, fond, beloved boy !

Ay—be it so—the days may come
When scenes may rise less bright and fair,
And thine may be a bitter doom,
And life burden hard to bear—
Why crowd these visions o'er my mind,
While others there a home should find ?

Th' uncertain future wakes the fear
I feel, but must not, dare not tell—
Yet Hope's sweet voice rings in mine ear
And whispers—All shall yet be well !
These thoughts are strangers to thy breast
Where all is pleasure, peace and rest.

These thoughts—but let them pass away,
And Hope shall linger here alone—
Still be thy heart, fair and light, and gay,
And gladness in thine every tone ;
Nor dream thou once, far o'er the sea,
That hearts are aching here for thee.

Then, o'er the boundless, watery waste
    To that far land where now thou art,
Be many a blessing borne to thee
    By guardian seraphs of the heart!
Yes—o'er the blue eternal sea
Be many a blessing born to thee.

August, 1826.

ON MORAL PHILOSOPHY

CHAPTER I

What is happiness, and what is misery ?

I call *pleasure* all perception which the mind would rather prove than not prove.

I call *pain* all perception which the mind would rather not prove than prove.

All perception in which the mind would fix itself, the absence of which it does not desire, during which it would not pass into another state, nor be at rest—all such perception is a *pleasure*. The time during which such a perception lasts is *a happy moment*.

All perception which the mind would avoid, the absence of which it desires, during which it would pass into another state, or be at rest—all such perception is pain. The time during which such a perception lasts is *an unhappy moment*.

I know not whether there are any perceptions which may be denominated *indifferent* perceptions. The absence or presence of which are perfectly alike to us. But if there be any such, it is evident that they cannot make any happy or unhappy moments.

In each happy or unhappy moment it is not enough to consider the duration : regard ought to be had to the greatness of the pleasure or the pain. To that greatness I give the name of *intensity*. The intensity may be so great that although the duration may be very short, a happy or unhappy moment shall be equal to another of which the duration is long and the intensity little. In the same way, the duration may be so long, that, although the intensity may be very little, a happy or unhappy moment shall be equal to another of which the intensity is great and the duration little.

We ought therefore in estimating happy or unhappy moments, not only to regard the *duration* but also the *inten-*

sity of the pleasure or pain. A double intensity and single duration may make one moment equal to another, of which the intensity is single, and the duration double. To express this generally we shall say, that in estimating happy or unhappy moments, they should be considered as *the product of the intensity of the pleasure or pain multiplied by the duration.* Such durations can be easily measured ; we have instruments which measure them, independently of devices which we can adopt. It is not so with these intensities. We cannot say whether the intensity of a pleasure or a pain is exactly double or triple the intensity of another pleasure or pain.

But although we have no exact measure for these intensities, we feel that some are greater than others and we do not give up comparing them. Everyman by a natural judgement **** the intensity and the duration in his confused estimation of happy or unhappy moments. Sometimes he prefers a little pleasure which continues for a length of time, to a greater one which passes rapidly away ; sometimes he prefers a very great but very short pleasure to a very little but very long one. This is also the case with pain. Although very great, it may be so short as to be more cheerfully borne than a smaller one of longer duration : and it may be so small, that although of long duration, it may be preferred to a very short but very intense pain. Each person makes these comparison as well as he can ; and although their calculations may be different, it is not the less true that the just estimation of happy or unhappy moments, is as we have stated—the product of the intensity of the pleasure or pain multiplied by the duration.

Good is a sum of happy moments.

Evil is a sum of unhappy moments.

It is evident that these sums to be equal should not occupy intervals of equal times. In that where there is more of intensity there should be less of duration ; in that where

**** Blank in the manuscript. *Ed*

the duration is great, the intensity should be little. These sums are the elements of happiness and misery.

Happiness is the sum of good that remains after deducting the evil.

Misery is the sum of good that remains after deducting the good.

Happiness and misery then depend upon the compensation of good and evil. The happiest man is not always he who has had the greater sum of good. The evils which he has encountered in the course of his life have diminished his happiness : and their sum may have been so great as to have diminished his happiness, more than the sum of good has increased it. The happiest man is he to whom the greatest sum of good and that of evil be equal, we cannot call him to whom such a lot has been assigned either a happy or an unhappy man. His life goes for nothing. If the sum of evil exceeded that of good he is unhappy in a greater or less degree. His life does not go for nothing. Thus, it is not until we make this last calculation, until a balance is struck between the sums of good and evil, that we can judge of happiness or misery.

Good and evil being the elements of happiness and misery, all one's care ought to be employed in obtaining a correct knowledge of them, to compare the one class with the other —and finally always to make choice of the greatest good and to avoid the greatest evil. But many difficulties beset this comparison : and each individual makes it in his own way.

One for the enjoyment of a few voluptuous moments, loses his health or destroys his fortune ; another refuses the most lively pleasures to obtain a treasure which he will never enjoy. This one languishes under the protracted agonies of the stone ; that sufferes the most cruel pain to be delivered from it.

And although good and evil appear to be very different *species*, we still compare those which appear the most heterogenous, with each other. Thus it was that Scipio found more

good in generous action than in all the pleasure which he could have enjoyed with his captive.

What adds to the difficulty of the comparison of good and evil, is, the different distances whence they are viewed. If we compare a remote with a present good, or a present with a remote evil, rarely shall we make a just comparison. This inequality of distance, however, causes difficulty only in practice : for the future which is apparently at our door when age and health are taken into consideration, ought to be regarded as near at least as the present.

There is yet another more difficult comparison and one that is not less necessary - it is that of good with evil. I mean here the estimation of evil which ought reasonably to be suffered that it may be compensated by such or such good or the estimation of good of which we ought to deprive ourselves to avoid such or such evil. Although this comparison cannot always be correctly made, there is an infinite number of cases in which we feel it advantageous to suffer an evil to enjoy a good or to abandon a good to avoid an evil. When good and evil are viewed at different distances the comparison becomes still more difficult.

It is in making all these comparisons that prudence consists. It is owing to their difficulty that few prudent persons are to be found ; and we may describe the infinite variety of human conduct to the different ways in which these calculations are made.

CHAPTER II

In Ordinary Life, the Sum of Evil Exceeds that of Good

We have defined *pleasure* to be all perception which the mind would rather prove than not prove ; all perception in which it would fix itself ; during which it would not pass into another state, nor be at rest. We have defined pain as to be all perception which the mind would rather not prove than prove ; all perception which it would avoid ; during which it would pass into anotner state or be at rest.

If life be examined according to these ideas, we shall be surprized, nay frightened, to find how full it is of pains, how barren of pleasures. How rare those perceptions in the presence of which the mind delights. What is life, but a continual wish to change its perceptions ? It is passed in desires ; and we would annihilate all the interval, which separates us from their accomplishment. Often would we have days, months and whole years suppressed ; and we never acquire any good without paying for it with our lives.

If God accomplished our desires, and suppressed for us all the time, which we would have suppressed, the old man would be surprized to see the little that he would have lived ; perhaps the duration of the longest life would be reduced to a few hours.

Now, all that time, the suppression of which we would wish for, in order to pass to the accomplishment of our desires that is to pass from some perceptions to the others—all that time is composed of unhappy moments.

There are few men, I think, who do not agree, that their lives have been more full of such moments than of happy ones, when they consider nothing more in these moments, than their *duration* ; but if regard were paid to their *intensity*,

the sum of evil would be much more increased, and the proposition, that *in ordinary life the sum of evil exceeds the sum of good*, would become more true.

All the amusements of men prove the misery of their condition. It is only to avoid painful perceptions, that one plays at chess and another follows the chase : all seek forgetfulness of themselves in serious or frivolous occupations. Now do these suffice ; they have recourse to other resources : some by means of liquors excite a tumult in their minds, during which it loses the idea, that torments it ; others by the fumes of the leaves of plant seek a giddiness for their cares ; others charm their pains by a juice, which throws them into a species of extacy. In Europe, Asia, Africa, all men, though ever so different, have sought remedies for the evils of life.

Were the inquiry made, we should find very few, from whatever condition they might be taken, who would recommence life as it has been, who would repass through all the states in which it has been. Would not this be the pleasant avowal, that there is more evil than good in life ?

Is this then the fate of human nature ? It is irrecoverably condemned to so severe a doom : or are there any means to change this proportion between good and evil. Is it not from the little use, or rather the bad use which man makes of his reason, that makes this proportion so fatal ? Would not a happier life be the reward of his reflexions and his exertions ?

CHAPTER III

Reflections on the Nature of Pleasure and Pains

Philosophers of all times have known the importance of seeking happiness, and have made it their principal study. If they have not found the proper road which leads to it, they have travelled along paths by which it may be approached. In comparing their discoveries in other sciences with the excellent precepts, which they have left us by which we may become happy, it will surprize us to see the greater progress that has been made in this science than in every other.

I shall not enter into a detail of the opinions entertained by all those greatmen, regarding happiness, nor shall I point out the particular differences, which prevailed in the sentiments of those who, in general matters belonged to the same sect.

Some, regarded the body as the sole instrument of happiness and misery, know of no pleasures, but those which depend upon impressions made by external objects upon our senses, and of no pains, but those which depend upon similar impressions.

Others again, ascribing too much to the mind admit of no pleasures or pains, but those which it finds in itself.

These opinions are extravagant, and equally remote from the truth. Impressions made by external objects on the body are sources of pleasure and pain ; and so are the operations of the mind. And although all these pleasures and pains may enter through different passages, they have this in common ; that they are perceptions of the mind, with which it is pleased or displeased, and which make happy or unhappy moments.

Let us not then be alarmed about comparing the pleasures of sense with the most intellectual pleasures; let us not create an illusory belief that there may be some pleasures of a less noble nature than others. The noblest pleasures are those which are the greatest.

Some philosophers go so far as to regard the body as altogether foreign to ourselves, and pretend that we could not even bring ourselves not to feel the accidents to which it is subject.

Others would not deceive themselves less were they to believe, that the impressions made by external objects on the body could so occupy the mind as to render it insensible to its reflexions.

All pleasures and pains belong to the mind.

HINDU WIDOW

A mistaken opinion, somewhat general in Europe, namely, the Hindu Widow's burning herself with the corpse of her husband, is an act of unparalleled magnanimity and devotion. To break those illusions which are pleasing to the mind, seems to me a task which no one is thanked for performing; nevertheless, he who does so, serves the cause of TRUTH. The fact is, that so far from any display of enthusiastic affection, *Sattee* is a spectacle of misery, exciting in the spectator a melancholy reflection upon the tyranny of superstition and priest-craft. The poor creatures who suffer from this inhuman rite, have but little notion of the heaven and the million years of uninterrupted happiness to which their spiritual guides tell them to look forward. The choice of immediate death, or a protracted existence, where to be only must content their desire, is all that is offered to them; and who under such circumstances would hesitate about the preference? The most degrading and humiliating household offices must be performed by a Hindu Widow; she is not allowed more food than will suffice to keep her alive; she must sleep upon the bare earth, and suffer indignities from the youngest members of her family. These are only a few of her sufferings. The philanthropic views of some individuals are directed to the abolition of widow-burning; but they should first ensure the comfort of these unhappy women in their widowhood, otherwise, instead of conferring a boon upon them, existence will be there of many a drudge and a load.

কবিতাগুচ্ছ

TO INDIA—MY NATIVE LAND

My country ! in thy day of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast.
Where is that glory, where that reverence now ?
Thy eagle pinion is chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou :
Thy minstrel hath no wreath to weave for thee
Save the sad story of thy misery !
Well—let me dive into the depths of time,
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime,
Which human eye may never more behold :
And let the guerdon of my labour be
My fallen country ! One kind wish from thee !

THE HARP OF INDIA

Why hang'st thou lonely on yon withered bough ?
Unstrung for ever, must thou there remain ?
Thy music once was sweet—who hears it now ?
Why doth the breeze sigh over thee in vain ?
Silence hath bound thee with her fatal chain ;
Neglected, mute, and desolate art thou,
Like ruined monument on desert plain
O ! many a hand more worthy far than mine
Once thy harmonious chords to sweetness gave,
And many a wreath for them did Fame entwine
Of flowers still blooming on the minstrel's grave :
Those hands are cold—but if thy notes divine
May be by mortal wakened once again,
Harp of my country, let me strike the strain !

SONNET TO THE PUPILS OF THE HINDU COLLEGE

Expanding like the petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds,
And sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers,
That stretch (like young birds in soft summer hours)
Their wings, to try their strength. O, how the winds
Of circumstances, and freshening April Showers
Of early knowledge, unnumbered kinds
Of new perceptions shed their influence ;
And how you worship truth's omnipotence.
What joyance rain upon me, when I see
Fame in the mirror of futurity,
Weaving the chaplets you have yet to gain,
Ah, then I feel I have not lived in vain.

SONNET

To those who originated and carried into effect the proposal for procuring a portrait of David Hara, Esq.

Your hand is on the helm—guide on young men
The bark that's freighted with your country's doom.
Your glories are but budding ; they shall bloom
Like fabled amaranths Elysian, when
The shore is won, even now within your pen,
And when your torch shall dissipate the gloom
That long has made your country but a tomb,
Or worse than tomb, the priest's, the tyrant's den,
Guide on, young men ; your course is well begun,
Hearts that are tuned to holiest harmony
With all that e'en in thought is good, must be
Best formed for deeds lipe those which shall be done
By you here after till your guerdon's won
And that which now is hope becomes reality.

ON THE ABOLITION OF SATTEE

"The practice of Sattee, or burning or burying alive the widows of Hindoos, is hereby declared illegal, and punishable by the Criminal courts." *Regulation XVII, 1829*

Red from his chambers came the morning sun
And frowned, dark Ganges, on thy fatal shore,
Journeying on high ; but when the day was done
He set in smiles, to rise in blood no more,
Hark ! heard ye not ? The widow's wail is over ;
No more the flames from impious pyres ascend,
See Mercy, now primeval peace restore,
While pagans glad the arch ethereal rend,
For India hails at last, her father and her friend.

Back to its cavern ebbs the tide of crime,
There fettered, locked, and powerless it sleeps ;
And History bending o'er the page of time.
Where many a mournful record still she keeps.
The widowed Hindoo's fate no longer weeps,
The priestly tyrant's cruel charm is broken,
O'er all the land 'tis sprerd : he trembles at the token.

Bentinck, be thine the everlasting mead,
The heart's full homage still is virtue's claim,
And 'tis the good man's ever honoured deed
Which gives an immortality to fame :
Transcient and fierce, though dazzling is the flame
That glory lights upon the wastes of war
Nations unborn shall venerate thy name
A triumph than the conqueror's mightier far
The memory shall be blessed as the morning star.

He is the friend of the man who breaks the seal
That despot custom sets on deed and thought,

He labours generously for human weal
Who holds the Omnipotence of fear as naught ;
'Twill sink to clay if it imprisoned be ;
For 'tis with high immortal longings fraught ;
And these are deemed or quenched eternally,
Until it feels the hand that sets its pinions free.

And woman hath endured, and still endures
Wrong, which her weakness and her woes should shield,
The slave and victim of the treacherous lures
Which wily arts, to man, the tyrant yield.
And *here* the sight of the star, or flower, or field
Or bird that journeys through the sunny air
Or social bliss from women has been sealed,
To her, the sky is dark, the earth is bare,
And Heaven's most hallowed breath pronounced for-
bidden fare.

Nurtured in darkness, born to many woes,
Words, the mind's instrument but ill supplied
Delight, even as a name she scarcely knows
And while an infant sold to be a bride ;
To be a mother her exalted pride,
And yet not her's as mothers sigh or smile
Oft doomed in youth to stem the icy tide
Of rude neglect, caused by some wanton's wile
And forced at last to grace her lord's funeral pile.

Daugherts of Europe ! by our Ganges side,
Which wept and murmured as it flowed along,
Have wives, yet virgins, may, yet infants, died,
While priestly fiends have yelled a dismal song
'Mid deafening clamours of the drum an gong
And mothers on their pyres have seen the hands
Which clung around them when those hands were young
Lighting around them such unholy brands
As demons kindle when the rave through hell in bands

But with prophetic ken, dispelling fears
Which haunt the mind that dwells on nature's plan
The Bard beholds through mists of coming years
A rising spirit speaking peace to man.
The storm is passing, and the rainbow's span
Stretch from north to south : ebon car
Of darkness rolls away : the breezes fan
The infant dawn, and morning's herald star
Comes trembling into day : O ! can the Sun be far ?

India.

THE POETRY OF HUMAN LIFE

Is human life not full of poetry ?
The common sounds we hear, the sights we see,
Are they not born of human hopes and fears,
Are not their offspring thoughts, and smiles and tears ?
These are the mystic elements of life,
And these with holiest poetry are rife.

Enamoured, we the moon's mild glories drink
And hold communion with the stars that wink
Enwearied with the vigil they have kept :
Nay ; we have heard, the minstrel's soul hath wept
Even o'er the fragile flowers that breathe and blush
On every bough ; the very grass we crush
At every step, with rash unpitying feet
Hath walked the heart to music strange and sweet.

But *MAN* has thoughts to which he giveth form
In words, that sometimes thunder like the storm,
And sometimes like the brooke's melodious flow
Melt into song ; and he hath hopes that glow
Visions af glory that ethereal be,
Dreams whose least part is immortality,
And whose embodying is divinest bliss ;
Is there not poetry most pure in this ?

Aye ; human life is truely full of all
That beauty and that magic which can call
Imaginings more pound and glorious forth
Then all the stars of heaven and flowers of earth.

INDEPENDENCE

Look on that lamp which seems to glide
Like a spirit o'er the stream,
Casting upon the darkened tide
Its own mysterious beam.
My heart,—and shall that little lamp,
My glorious image be ;
Shall the might so mirk, the stream so damp
Be it lit and cheered by thee.
Lo ! in the breath of the tyrant wind
The trembling flame looks wan
And pale, as if fear had seized its mind
It fades, alas, 'tis gone !
And wilt thou tremble so, my heart,
When the mighty breathe on thee ?
And shall thy light like this depart ?
Away ! it cannot be.

FREEDOM OF THE SLAVE

"As the Slave departs, the Man returns"—*Campbell*

How felt he when he first was told
A slave he ceased to be,
How proudly beat his heart, when first
He knew that he was free !—
The noblest feelings of the soul
To glow at once began,

He knelt no more, his thoughts were raised,
He felt himself a man.
He looked above—the breath of heaven.
Around him freshly blew,
He smiled exultingly to see
The wild birds as they flew,
He looked upon the running stream
That 'neath him rolled away ;
Then thought on winds, and birds, and floods,
And cried, 'I'm free as they !'
Oh freedom ! there is something dear
E'en in thy very name,
That iights the altar of the soul
With everlasting flame.
Success attend the patriot sword,
That is unsheathed for thee !
And glory to the breast that bleeds,
Bleed nobly to be free !
Blest be the generous hand that breaks
The chain that tyrant gave,
And, feeling for degraded man,
Gives freedom to the slave.

LINES ON THE GRAVE-STONE

We look around
But vainly look for those who formed a part
Of us as we of them, and when we wore
Like gems in bezels, in the heart's deep core.

Where are they now ? gone to that narrow cell
Whose gloom no lamp hath broken nor shall break
Whose secrets never spirits came to tell—
Oh ! that their day might dawn, for they would awake.

THE POET'S GRAVE

Be it beside the ocean's foamy surge
On an untrodden, solitary shore,
Where the wind sings an everlasting dirge
And wild wave, in its tremendous roar,
Sweeps o'er the sod !—There let his ashes lie
Cold and unmourned ; save, when the seamew's cry
Is wafted on the gale, as if 'twere given
For him whose hand is cold, whose lyre is riven !
There, all in silence, let him sleep his sleep !
No dream shall fit into that slumber deep—
No wandering mortal thither once shall wend,
There nothing o'er him but the heavens shall weep,
There never pilgrim at his shrine shall bend,
But holy stars alone their nighty vigils keep !

CUST

Of soft cerulean colour was the sky,
The sun had not yet risen o'er the scene
The wild lark sank his morning hymn on high
And heaven breathed sweetly o'er the foliage green :
Julian and I walked forth, and soon we came
Upto the tomb of a high son of fame ;
The marble told his deeds, his years, and name.
Struck with his greatness, and the sounding praise
That was bestowed upon him, I began
Almost to envy him the race he ran :
Man is a noble work, the wise man says,
And so said I : but Julian stopped, and took
Some dust up in his hand, and bade me look
Upon it well, and then he cried, 'See, this is man !'

THE TOMB

'Tis the house for dust and ashes
Which the white worm revels o'er
'Tis the land whence those who enter,
To this earth return no more.
'Tis the cave of silent darkness,
Which no mortal power can break,
'Tis the bed where they who slumber
From that slumber never wake.
'Tis the dreary, dismal ocean
Which we all must travel o'er,
For long ages, without ceasing,
Till we reach the blissful shore.
'Tis the desert lone and weary
Of red flame and burning sand,
Which the soul must pass unmurm' ring
Ere it win the promised land.
'Tis the land where proudest despots
Have no power to tyrannise ;
Where the blood of injured Freedom
For swift Vengeance loudly cries.
Where the check of beauty fading,
Does but fade to bloom again ;
Where the conqueror is conquered,
And the captive breaks his chain.
'Tis the place where quenched is madness,
And where hush'd the wail of grief,
Where the desolate are smiling ;
And the wretched find relief ;
'Tis where woe is all forgotten,
And the riven heart is blest ;
Where the wicked cease from troubling,
And the weary are at rest.

YORICK'S SKULL

I Clown. "....this same skull, Sir, was, Sir,
Yorick's shull, the King's jester."
Hamlet : "This ?"
I Clown. "E'en that."
Hāmlet. [He takes the skull] "···Alas poor Yorick !
Now get to my lady's chamber, and tell her, let her paint an ince-thick, to this favors she must come. Make her laught at that···"

It is a most humiliating thought,
That man, who deems himself the lord of all,
(Alas ! why doth he thus himself miscal ?)
Must one day turn to nought, or worse than nought ;
Despite of all his glory, he must fall
Like a frail leaf in autumn ; and his power
Weighs lighter than his breath in his last hour ;
And then earth's lord is faagile as a flower—
This is a lesson for thee, Pride !—thy book
Should be the charnel ; into it once look,
And when thou'st read it, feed upon the thought,
The most humiliating thought, that thine
And thou shall be unto this favour one day brought
Behold ! this is the 'Human face divine !'

ROMEO AND JULIET

"Oh, Love ! what is it in this world of ours
Which makes it fatal to be, loved ?"

Don Juan, Canto III

I thought upon their fate, and wept ; and then
Came to my mind the silent hour of night,
The hour which lovers love and long for, when
Their young impassioned souls feel that delight

Which Love's first dream bestows,—How Juliet's ear
Drank every soft word of her cavalier !
And how, when his departing hour drew nigh.
She fondly called him back to her !—
Oh ! Why Did she then call him back ?—It is the same
With all whom love may dwell with, but the flame
Within their breasts was a consuming fire,
'A was passion's essence ; it was something higher
Than aught that life presents ; it was above
All that we see—'t was all we dream of love.

SISTER-IN-LAW

A sister-in-law, my sister dear,
A sister-in-law for thee ?
I'll bring thee a star from where angel's are
Thy sister-in-law to be.
For thou art as pure the lights that burn
In the palace of bliss eternally,
And thy sister-in-law must be like an urn,
Containing the essence of purity.

I'll borrow fleet wings from the visions of night,
And when with storms the heavens are dim,
Like a thought or a seraph, I'll shape my flight
Until I have reached the rainbow's rim.
And thence I'll bring, my sister dear,
A sister-in-law for thee,
A hue from that bow I'll bring here below.
Thy sister-in-law to be.

I'll shoot like a beam from the golden haired sun
Down, down to those bright coral caves,
Where the mysteries dark of old ocean are done,
And the mermaid her amber locks laves.

And I'll bring thee a gem from rich diadem,
On the brow of the queen of the sea ;
That jewel so rare on my bossom I'll bear
Thy sister-in-law to be.

On the hippogriff-wing of that moon-stricken thing
Wild fancy, to whom it is given
With its flight to describe round all nature a ring
Will I mount up to heaven, to heaven.
From the amaranth beds that are there I shall bring
An odour immortal for thee :
For it is but meet that nought but what's sweet
Thy sister-in-law to be.

SONG OF THE INDIAN GIRL

My dream was bright, but it past away,
The thought so sweet is gone—
And hope hath fled, like a rainbow's ray
Or a beam of the setting sun !
But I am left, like an autumn leaf,
To the pitiless world, and the blast of grief,
Till my day of life is done !—
Spirit of love ! O bear my soul
Farther than Gunga's water roll,

HYMN

Reise, Raise, Raise,

Beyond the sapphire gates of the sky,
Beyond the realm where spirits high
On view-less wings have essayed to fly,
Our hymn of love and praise !

"The breeze is awake : from his snowy bed,
Where he all night dreaming lay,
Like a gladsome god he is up, and hath fled
Invisibly, far away.

The day, the day, the infant day.
Hath called him to his loll ;
And we who dwell
In this dew-gemmed dell,
State from the world's turmoil,
To the king to the lotus-throne above
Waft our hymn of praise and love.
Light, Light, Light.

A precious gift on the mountain flings
A hue that seems caught from a spirit's wings ;
As if the stream that flows around
The emerald hale of the gods had found
Some path to earth, or without a sound
Had burst its bound.
And rolled through space in torrent bright.
Is there no voice in this solitude,
Which tells the soul in its calmer mood
Of a world of bliss, untinged with care
Beyond the interstellar air,
And bids it raise
Its hymn of praise
And love, to the One Eternal Good ?
There is a voice in the wandering breeze,
Which says—it is by divine command
That the tempest rides over troubled seas,
Or raves, like maniac, through the land.
And ever is seen
In the vernal green
Which clothes the mountain trees,
And omnific hand

And a mind that planned
Whatever the vision sees :
And all that dwell in earth and air,
Or in the unseen caves of the deep,
Where the mighty spirits of ocean sleep,
With one consenting voice declare,
That He, who bids the day-god shed
Rich blessings from his golden hair
And at whose command our earth has spread
Her choicest gifts on her bosoms fair ;
That he who bid Himavat rise,
To bear on his shoulders vast the skies
And who, when they beamed into life, told the stars
The course, in which they should guide their cars,
Who is around, and beneath, and above,
Is worthy forever of praise, and of love.

CHORUS OF BRAHMINS

Scatter, scatter flowerets round,
Let the tinkling cymbal sound ;
Strew scented orient spice
Prelude to the sacrifice ;
Bring the balm, and bring the myrrh,
Sweet as is the breath of her
Who upon the funeral pyre
Shall, ere Surya sets, expire,
Let pure in cense to the skies
Like the heart's warm wishes rise,
Til l, unto the lotus throne
Of the great Eternal One
High ascending, it may please
Him who guides our destinies,
l of purest white,
Bring the diamond flashing light ;

Bring your gifts of choicest things,
Fans of peacocks' starry wings
Gold refined, and ivory,
Branches of the sandal tree,
Which their fragrance still impart
Like the good man's injured heart,
This its triumph, this its boast,
Sweetest 'tis when wounded most !
Ere he sets the golden sun
Must with richest gifts be won,
Ere his glorious brow he lave
In yon sacred yellow wave,
Rising through the realms of air
He must hear the widow's prayer—
Haste ye, haste, the day declines
Onward, onward while he shines,
Let us press, and all shall see
Glory of our Deity.

MORNING AFTER A STORM

I

The elements were all at peace, when I
Wandered abroad at morning's earliest hour,
Not to inhale the fragrance of a flower,
Or gaze upon a sun-illumined sky :
To mark the havoc that storm had made
I wandered forth, and saw great Nature's power.
The hamlet was in desolation laid
By the strong spirits of the storm ; there lay
Around me many a branch of giant trees.
Scattered as leaves are by the southern breeze
Upon a brook, or an autumnal day ;
Cloud piled on cloud was there, and they did seem
Like the fantastic figures of a dream,
Till morning brighter grew, and then they rolled away.

II

Oh ! Nature, how I love thy face ! and now
That there was freshness on they placid brow.
While I looked on thee with extreme delight,
How leapt my young heart at the lovely sight !
Heaven breathed upon me sweetly, and its breath
Was like the fragrance of a rosy wreath.
The river was wreck-strewn : its gentle breast
Was like the heart of innocence, at rest ;
I stood upon its grass-grown bank, and smiled,
Cleaving the wave with pebbles like a child,
And marking, as they rose those circles fair
Which grew, and grew, then vanished :—but Oh ! there
I learned a moral lesson, which I'll store—
Within my bosom's deepest inmost core.

অনুবাদগুচ্ছ

ভারত আমার, স্বদেশ আমার

দূর অতীতের স্বর্ণপ্রহরে ঘিরেছিল মুখ বলয়রশ্মি
ভারত আমার! গরীয়সী দেশ, ছিলে যে সেদিন দেবীরই মতে!
ঈগলের পাখা শৃংখলে বাঁধা সে পড়ে রয়েছে পিছে সবার :
ব্যথাটুকু ছাড়া চারণের কাছে নেই আর কোনো উপকরণ
গাঁথবার মতো কাহিনীরা সব হারিয়ে গিয়েছে ইতস্তত,
ধূলার গভীরে ডুবেছ ভারত, কালের ভূমিতে সমাধিলীন
আমাকেও সেই কালের ধূলায় ঝাঁপ দিতে দাও একটিবার,
খুঁজে নিয়ে আসি হারানো দিনের ভাঙা-চোরা কিছু নিদর্শন
চোখের সামনে নেই তারা আজ ভূমায় নিবিড় সে সব সৃষ্টি
এই শ্রমটুকু দিয়ে বিনিময়ে অনভীপ্সিত মূল্যপ্রাপ্তি
তোমার মুখের আশীর্বচন, সেই শুধু হোক পুরস্কার ॥

'My Country ! in thy day of glory past'

আমার দেশের বীণা

ম্লান পুষ্পের বিজন কুঞ্জে তুমি পড়ে আছ একা
তারগুলো ছেঁড়া, সেকি চিরকাল ? রইবে কি সেখানেই ?
তোমার সাতটি স্বর মধুঝরা ছিল, আহা, সেই কবে,
ঝংকারধ্বনি কেউ শোনে না ত, বৃথাই বাতাস কাঁদে।
স্তব্ধ সময় তোমাকে রেখেছে শৃংখল দিয়ে বেঁধে
একা পড়ে আছ উপেক্ষা-ঢাকা, তুমি নিরুদ্ধবাণী
ভাঙা মিনারের মতো চারিদিকে ধূ ধূ ফাঁকা মরুভূমি ;
কত শিল্পীর আঙুলের ছোঁয়া তোমাকে বাজাত সুরে,
কবির কণ্ঠে সুরের সঙ্গে দুলতো যশের মাল্য—
সেই সৌরভ এখনও ভাসে তাদের সমাধিভূমে

শিল্পীর হাতে, কবির কণ্ঠে, এখন স্তব্ধ তারা —
জাগবে আবার মীড়ে-মূর্ছনে তবু তুমি যদি বাজো
স্বর্গলোকের স্বরস্পন্দনে, আমার দেশের বীণা !
শুধু একবার আমার স্পর্শে বেজে ওঠো ঝংকারে !

'Why hangst thou lonely on yon withered bough'

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশে

না-ফোটা কুঁড়ির মতো তোমাদের মনগুলি দেখি
যখন পাপড়ি মেলে—কখনো বা স্থস্মিত মধুরে
সজ্ঘবদ্ধ ক্ষমতায়— উদ্যমেতে ডানা মেলে সে-কি
ছোট্ট পাখির মতো, মৃদুমন্দ গ্রীষ্মের দুপুরে
সময়ের সমীরণে— শুচিস্মিতা বৈশাখী বর্ষণে ;
প্রথম প্রজ্ঞার বৃষ্টি ঝর ঝর অযুত কণায়
নতুন ভাবনারাশি সমুজ্জ্বল সত্যের শরণে—
তোমাদের মগ্ন দেখি—লীন দেখি ধ্রুব সাধনায়
যখন, তখন আমি কী আনন্দে হই আত্মগত !
ভবিষ্য-দর্পণে দেখি স্থনিপুণ কালের বুননে
তোমাদের যশোমাল্য গাঁথা হয়ে চলে অবিরত,
তখন তৃপ্তির ঢেউ দোলা দেয় আমার এ- মনে,
অনুভবে বুঝি তবে, ব্যর্থ নয় আমার জীবন—
কী সাফল্যে ধন্য হল জীবনের পরম অর্জন ॥

'Expanding like the petals of young flowers'

সনেট : ডেভিড হেআরের অনুরাগীদের প্রতি

তোমরা ধরেছ হাল, দিয়ে যাও পথের নিশানা সুনিশ্চিত,
তরুণ কাণ্ডারীদল! স্বদেশের এ তরণী বিপর্যয়ে ভরা।
তোমাদের গৌরবের কুঁড়িগুলি সবেমাত্র মেলেছে পশরা,
নন্দনের পারিজাত হয়ে তারা একদিন হবে বিকশিত।
সাফল্যের উপকূলে এ দেশের এই তরী পৌঁছবে যখন,
মনোলোকে তোমাদের সেই তীর দৃশ্যমান হল এখনি ত,
তোমাদের বর্তিকায় বিষাদের অন্ধকার হবে অপসৃত,
যে বিষাদে ভারাক্রান্ত আমাদের দেশজোড়া শ্মশান-প্রাঙ্গণ।
[অথবা শ্মশান নয়, স্বৈরাচারী যাজকের গুহা ভয়ঙ্কর!]
অন্তরের অবলীনে সাফল্যের সামগানে সমবেত স্তব
এখন, সমস্ত কিছু, সব চিন্তা, হোক তবে মহনীয়তর
পথের নিশানা দিয়ে, ধেয়ে চল সগৌরবে তরুণ কাণ্ডারী!
এ যাত্রার শুভারম্ভ হয়ে গেছে, বাকি শুধু পুরস্কার তারি
সিদ্ধকাম প্রত্যাশারা হোক তবে এই বারে পরম বাস্তব ॥

'Your hand is on helm—guide on young men'

সতী-প্রথা বিলোপে

ভোরের সূর্য ঘুম ভেঙে উঠে রক্তিম চোখে দেখে
ভ্রূকুটি কঠিন, কালো জল ছলে গঙ্গার তীরে তীরে
বেলা শেষ হলে সেই সূর্যই হাসল দিনের অন্তে
রক্তের ঢেউয়ে স্নান করা তার কাল থেকে হল সারা।
শুনিস নি তোরা? শুনিস নি কানে? দুঃখের দিন শেষ
স্বামীহারা সব অভাগিনীদের আর্তনাদের ক্ষান্তি,
কলুষিত হয়ে চিতার আগুন আর জ্বলে উঠবে না
চেয়ে দেখ দয়া, আদিম শান্তি ফের ফিরে এল তবে।

পৌত্তলিকেরা পরিতৃপ্ত, রামধনু ভেঙে যায়
ভারতবর্ষ 'জয় ! জয় !' হাঁকে বন্ধুর উদ্দেশে।

পাপের প্রবাহ ফিরে চলে গেল গুহার উৎসমুখে
শৃঙ্খলে বাঁধা কলুষ সেখানে ঘুমোবে বন্দী হয়ে
মহাকাল তার পাতা উল্‌টায়, পুঁথির আখরে যত
বেদনা এবং অত্যাচারের খতিয়ান লেখা আছে।
ধর্মের নামে উৎপীড়কের কুটিল শাঠ্য ভাঙে
ভীরু রাক্ষস লুকোতে চলল গুহার অন্ধকারে
সম্মোহনের মায়ার মন্ত্র খান্ খান্ একেবারে
সারা দেশ জুড়ে ভেঙে চুরে গেল, দানবেরা ভয়ে কাঁপে।

বেন্টিংক ! পাও চিরদিন ধরে অবিনশ্বর খ্যাতি
ভরা-হৃদয়ের শ্রদ্ধার ডালি, পুণ্যের অধিকারে
সন্তজনের চিরশ্রদ্ধেয় তোমার মহৎ কীর্তি
তোমার নামকে চিরন্তনতা দিয়েছে সুনিশ্চিত।
ভয়াল, তীব্র, যদিও ক্ষণিক, জলেছে অগ্নিশিখা
গৌরব জলে যুদ্ধান্তের ধ্বংসস্তূপের পুঞ্জে
আজো অনাগত যে জাতিরা আছে তারা দেবে জয়ধ্বনি
মহাযোদ্ধার বিজয়ের থেকে এ জয় মহত্তর,
তোমার স্মৃতির শুকতারা হবে ভোরের আশীর্বাদ।

তিনি মানুষের সুহৃদোত্তম, ভেঙেছেন আবরণ
স্বৈরাচারীর বিধিবিধানের—চেতনা এবং কর্মে,
মানুষের শুভ প্রত্যাশে তাঁর সফল পরিশ্রম
বিধাতার ভয়, তাও যে মিথ্যা—সেই তাঁর ধ্রুব বাণী।
মানুষের মন মুক্ত-পাখ্‌না, বাঁধা আর পড়বে না
কাদামাটি-লেপা ধূলার ধরায় সে আর রবে না বন্দী ;
সমুচ্চ যত অমৃত-বাসনা সঞ্চিত যত ছিল
বাঁধন-খোলানো সেই হাতে হল তৃষ্ণার নিরসন।

নারীর বেদনা সুচিরকালের, এখনও টি কে আছে,
অন্যায় তার দুঃখ এবং দুর্বলতাকে ঢাকে,
স্বৈরাচারীর প্রলোভন-কলা বন্দী করেছে ছলে,
নারীকে করেছে সেবাদাসী আর পুরুষকে ক্রীতদাস।
রুদ্ধ এখানে নারীর নয়নে তারা-ফুল-শ্যামা মাঠ,
সোনালি রোদের হাওয়ায় পাখ্‌না-ভাসানো পাখির ঝাঁক,
এখানে নিষেধ সব আনন্দ, স্বর্গের আলো যত—
তার দুই চোখে শুধু ধূ-ধূ মাঠ, আর—কালো অম্বর।

তমসা-লালিতা, ব্যথার জাতিকা, রুদ্ধবচনা নারী
শৈশবেতেই বিকিকিনি সারা নিরানন্দের হাটে,
মাতৃত্বের মহান গর্বে অনধিকারিণী সে যে,
মায়ের মুখের হাসি আর তার হৃদয়ের উদ্বেগ,
তাও তার নয় ; তার যৌবন শীতল উপেক্ষায়
প্রত্যাখ্যাত হয়ত হয়েছে কুটিলের কলা-ছলে—
শেষ পরিণামে স্বামীর চিতায় আত্মাহুতির পালা।

প্রতীচী-দুহিতা ! তোমরা শুনেছো ?—এই গঙ্গার কূলে
ক্রন্দসী নদী মর্মর স্বরে বেদনায় বহে যায়—
বধূরা এখানে কুমারীও থাকে, শৈশবে বধূ হয় ;
ভয়াল-স্বভাব যাজকেরা গায় ভয়ংকরের গান,
উন্মাদ রবে তীব্র নিনাদে কাঁসর ঘণ্টা বাজে
অবিরাম ঢাক, মায়েরা করুণ দু’ নয়ন মেলে দেখে
কচি হাতগুলি—এই ত এখুনি কণ্ঠে জড়ানো ছিল
চিতাশয্যায় ওঠবার আগে ; কলুষ-হাতের জ্বালা
দানবী-অনলে লেলিহান হয়ে নরকের শিখা জ্বলে।

প্রকৃতির কোলে লালিত চারণ, নির্ভয় মনে দেখে
ভবিষ্যতের প্রজ্ঞার চোখে কুহেলির জাল কেটে
আগামী দিনের উদয়োন্মুখ সত্তার আগমন,

মানুষের কানে শোনাতে আসছে স্বস্তির আশ্বাস।
ঝড় চলে যায়, রামধনু ওঠে সারা দিগন্ত জুড়ে,
তমসায় ঢাকা আঁধার শকট, বিদায় নিয়েছে সেও,
বাতাসে বাতাসে ভোরের জাতক উদ্বেল হয়ে ওঠে—
শুকতারা, এসে দিনের দুয়ারে করাঘাত করে ডাকে :
ভারতবর্ষ ! সূর্যোদয়ের এখনো কি দেরী আছে ?

'Red from his chamber come the morning sun'

জীবনের গান

জীবন কি কবিতার পরিপূর্ণ নয় ?
অতি সাধারণ স্বর, দৃশ্য কিংবা আরো যারা,
তাদেরও কি জন্ম নয় মানুষের শোক, সুখ থেকে ?
হাসি অশ্রু-ভাবনারা, তারাও ত জীবন-সম্ভব।
এই সবই, জীবনের মরমিয়া বস্তুর সঞ্চয়,
এই নিয়েই পূর্ণ হয় জীবনের পুণ্য কবিতারা।

আমরা প্রলুব্ধ হই সোমরসে মৃদুমন্দ পূর্ণ চন্দ্রিমার ;
তাছাড়া প্রহরা-ক্লান্ত তারাদের মিট্‌মিটে চোখ
আমাদের সাথে তারা বাঁধা থাকে বন্ধনে আত্মার ;
তাও নয় ! আমরা ত শুনেছিই চারণের অন্তহীন শোক।

ফুলবনে ফুটেছে যে ফুলগুলি তারা নয় স্থায়ী ;
ঘাসে-ঘাসে প্রতিক্ষণে অকরুণ অথচ নিশ্চিত
পদক্ষেপে দলে চলি, অনিবার তবু শুনে যাই
একটি আশ্চর্য সুর ফুল থেকে, ঘাস থেকে সদাই উত্থিত !

যেহেতু মানুষই পারে মননের ভাবনাকে বস্তুরূপ দিতে
কথা দিয়ে, যে কথারা ঘূর্ণিবৎ বজ্রস্বরা কখনো কখনো,

আবার কখনো যেন সে কথাই গান গায় সুরেলা নদীতে,
ঈথারে বিলীন থাকে—পাশাপাশি মানুষের আশান্বিত মনও।
দু'একটি স্বপ্ন শুধু খুঁজে পায় প্রত্যাশার অমর মহিমা,
স্বপ্নগুলি নেমে আসে নন্দনের অপর্যাপ্ত আশীর্বাদ হয়ে।
তারি মাঝে সমুজ্জ্বল জীবনের স্পন্দমান কবিতার সীমা,
এই মন, এ জীবন পূর্ণে লীন রূপমতী ছন্দের প্রত্যয়ে।
শুভ্র দ্যুতিমান্ হয়ে চরিতার্থ সেই নব মোহিনী কল্পনা,
শুধু ফুল, তারা নয়—জীবনে সুন্দর কবিতার কণা ॥

'Is human life not full of poetry ?

স্বাধিকার

ওই দীপটিকে তুমি চেয়ে তুমি চেয়ে দেখ দুটি-চোখ মেলে
ও যেন বিদেহী সত্তা, স্রোতোস্বনা জলে আলো ফেলে
ভেসে যায় অবিরাম অন্ধকার - ঢেউয়ের ওপরে
কুহকিনী ছটা মেলে ক্লান্তিহীন ও যেন সঞ্চরে।

আমার এ হৃদয় আর তুচ্ছ ওই প্রদীপ অস্থির
ও যেন আমারই ঠিক কোনো এক রূপক গভীর
রাতের আঁধার এত গাঢ় হবে, স্রোত এত ভিজে,
হৃদয় দেবে না তুমি, আলো আর প্রেরণা কি নিজে ?

দেখ ! ওই অত্যাচারী বাতাসের নিষ্ঠুর নিঃশ্বাসে
দীপের উজ্জ্বল শিখা, কেঁপে - কেঁপে ম্লান হয়ে আসে,
পাণ্ডুর দীপের মন, সে কি হল দিশেহারা ভয়ে ?
ম্রিয়মাণ দীপশিখা হায় ! গেল নির্বাপিত হয়ে।

তুমিও কি, হে হৃদয়, কম্পমান হবে কোনোদিন,
যদি তুমি কখনোও প্রবলের হও সম্মুখীন ?

তোমারও কি এ ভাবেই ম্রিয়মাণ আলো নিভবে না ?
কখনো না ! সে ঘটনা, ঘটবে না—ঘটতে পারে না !

'Look on that lamp which seems to glide'

ক্রীতদাসের মুক্তি

গোলামির পালা শেষ। কি এক বিচিত্র অনুভূতি !
মুক্তি পেয়ে সমুদ্বেল বুক ভরে গর্বের স্পন্দনে
সহসা ভাস্বর হল অন্তরের মহৎ প্রস্তুতি
নতজানু-দাসত্বের ক্রান্তির ঘোষণা সেই ক্ষণে :
নিজেকে চিনেছে দাস মানুষের আত্মার সম্মানে,
আকাশে তাকিয়ে নেয় নন্দনের বাতাসে জীবন,
বুনো পাখিদের ঝাঁক উড়ে যায়, দেখে ঊর্ধ্বপানে,
মৃদু হাসি মুখে মেখে নিজেকেই জানায় বন্দন !
ওদিকেতে চেয়ে দেখে কলস্বরে ঝর্ণা চলে নেচে,
বাতাস—পাখিরা—আর ঝর্ণা দেখে ভাবে কি খানিক,
'আমিও ওদের মতো মুক্ত হয়ে রয়েছি ত বেঁচে !'
সহসা চেঁচিয়ে ওঠে অতঃপর ভুলে দিগ্বিদিক।

মুক্তি ! নাম থেকে ঝরে সুনিবিড় মাধুর্য তোমার,
হৃদয়ের বেদীতটে জেলেছ যে শিখা অনির্বাণ,
স্বদেশের মুক্তিযজ্ঞে উদ্ভাসিত খোলা তলোয়ার
শোণিতের পুণ্য-অর্ঘ্যে এনেছ কি মুক্তির সম্মান !
ধন্য হোক সেই হাত করেছে খান্ খান্
শোষণের শিকলকে ; ধন্য হোক আত্মপ্রসাদ
নিপীড়িত মানবাত্মা যার বলে হল বলীয়ান্
ক্রীতদাস পেল যাতে অবশেষে মুক্তির আস্বাদ ॥

'How felt he when he first was told…'

প্রত্যাশা

এদিকে-সেদিকে আজ যতই না চাই : তাকাই বৃথাই।
নাই, তারা নাই। তাদের সান্নিধ্যগুলি উপভোগ কত
করেছি আমরা, আহা! পরেওছি মানিকের মতো
মনের গহন কণ্ঠে, পল্-কেটে : আজ তারা নাই।

এখন কোথায় তারা ?……চলে গেছে ধরিত্রীর গর্ভগৃহে সেই
কোনোদিন দীপালোক ভাঙেনি বা ভাঙবে না যার বিষণ্ণতা
কখনো প্রেতেরা এসে গূঢ় সত্য ভাঙেনি কো, বলেনি তো কথা :
যেদিন সকাল হবে, তারা সব ভেঙে জেগে উঠবেই।

'We look around, but vainly…,

আমার সমাধি

আমাকে সমাধি দিও সাগরের ফেনোচ্ছল কূলে
জনহীন বেলাভূমি—পদক্ষেপ করবে না কেউ,
বাতাসের শোকগাথা—হু-হু শব্দে কান্না ফুলে-ফুলে
তীব্রস্বরে ডেকে যাবে উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের ঢেউ—
আছড়াবে বালিয়াড়ি, সেইখানে ফেল ভস্মশেষ
শোকহীন নিরুত্তাপ ; কেঁদে যাবে সমুদ্র-শকুন
[মিলাবে ঢেউয়ের শব্দে কান্নার ক্ষীয়মান রেশ]
তারই জন্য, স্তব্ধস্বর যে অভাগা—হিমেল, করুণ

বালিতে ঘুমোবে শুয়ে, নির্জনেতে, সর্বশেষ ঘুম ;
স্বপ্ন দেখা সাঙ্গ তার ; জনহীন সমুদ্রের কূলে
স্বর্গ-ঝরা অশ্রুজলে ভিজে যাবে কবর নিঝুম ;
কোনোদিন তীর্থ সেরে যাত্রীদল আসবে না ভুলে

সেই পথে ; পুষ্প-অর্ঘ্যে শ্রদ্ধানত হবে না তো তারা
তন্দ্রাহীন তারাদল দেবে শুধু রাতের পাহারা ॥

'Be it beside the ocean's foamy surge'

ধুলো

তখনো ওঠেনি সূর্য নীলাভায় ভরেছে চৌদিক,
বুনো পাখি কলস্বরে উড়ে গেছে গেয়ে বৈতালিক ;
নন্দনের হাওয়া এসে মৃদুমন্দ দুলিয়েছে চূড়া
শ্যামলিম তরুশীর্ষে, দীর্ঘ সব প্রাচীন তরুরা।
দুজনে পথিক শুধু, দুই বন্ধু, জুলিয়ান ও আমি
কোনো এক প্রখ্যাতের কবরের পাশে এসে থামি ;
পাথরের বুকে লেখা নাম, ধাম, গুণাবলী যত
মৃতের মাহাত্ম্য জেনে আমি প্রায় ঈর্ষায় নিহত !
'কর্মেই মানুষ বড়' জ্ঞানীজন বলেছেন, তাই
আমিও নকল করে সে কথাই ফের আওড়াই ;
হঠাৎ আমার বন্ধু ঝুঁকে পড়ে সমাধির পাশে
কবরের মাটি ছাঁকে, একমুঠো ধুলোর তল্লাসে
আমাকে তাকাতে দেখে বলে ওঠে তীব্র স্বরে অতি ঃ
'দেখে নাও, এই হল মানুষের শেষ পরিণতি !'

'Of soft cerulean colour was the sky…'

কবর

ধূলি আর ভস্মরাশি এখানেতে জমা স্তূপাকার
বল্মীকেরা ইতস্তত আশেপাশে বেড়িয়ে বেড়ায়

এ দেশে যখনই যে এসেছে, সে ফিরবে না আর
কোনোদিন সংসারের ফেলে-আসা অনিত্য ডেরায়।
শব্দহীন অন্ধকারে লীন হওয়া এ গুহা অচেনা,
স্তব্ধ এই আঁধারকে ভেঙে-ফেলা সাধ্যাতীত জানি
সব মানুষেরই কাছে ; যে ঘুমেরা আর ভাঙবে না—
সেই ঘুমে লীন যারা, তাদেরই ত এই শয্যাখানি।

বিষণ্ণ-ক্লান্তিতে ভরা এই এক মহাসমুদ্রের
ঢেউ ভেঙে একদিন পাড়ি দিতে হবে পাল তুলে
সকলেরই অবিরাম ; পথটাও দীর্ঘ জানি ঢের
যে অবধি পৌঁছব না প্রশান্তির স্থির উপকূলে।
এই এক মরুভূমি সঙ্গীহীন উৎকণ্ঠাতেই
নিশ্চুপ অস্তিত্ব সব একদিন হয়ে যাবে পার
বালুকণা তপ্ত হয়ে উঠুক না যত ঝল্‌সেই,
পৌঁছবে ত্বরিত পায়ে সেই দেশে চিরপ্রত্যাশার।
বিভীষিকা দেখাবার সবটুকু ক্ষমতা হারায়
এ রাজত্বে সবচেয়ে অহংকৃত উদ্ধত দানব,
রক্তাক্ত মুক্তির সত্তা তরান্বিত প্রতিশোধেচ্ছায়
অকস্মাৎ তীব্র কণ্ঠে করে তোলে নিজেকে সরব।
এখানে রূপের রাশি ম্লানিমায় ডুবে লীন হয়
যদিও আবার তারা একদিন ফুটে উঠবেই
এখানেই দিগ্বিজয়ী মেনে নিতে বাধ্য পরাজয়
বন্দীর শৃঙ্খলবন্ধ ছিন্নভিন্ন হবে এখানেই।
সব উন্মাদনা শান্ত এই এক বিচিত্র প্রদেশে
বেদনার হাহাকার অকস্মাৎ এখানে নিশ্চুপ
সঙ্গীহীন ছন্নছাড়া স্মিতমুখ এখানেতে এসে
লাঞ্ছিত যে আজীবন, সেও দেখে আশ্বাসের রূপ।
পরিণামে মিশে যায় বিস্মরণে এখানে বেদনা
বিক্ষুব্ধ হৃদয়গুলি আশীর্বাদ পায় অবিরাম

এইখানে অত্যাচারী বন্ধ করে সমস্ত লাঞ্ছনা
ক্লান্ত মানুষেরা পায় এইখানে চূড়ান্ত বিশ্রাম ॥

'Tis the house for dust and ashes…'

করোটি

এই হল বৃহত্তম অসম্মান চেতনার স্তরে
মানুষ নিজেকে ভেবে সর্বেশ্বর, বৃথা দম্ভে মাতে
[কেন যে মানুষ ডাকে নিজেকে এ ভুয়ো নাম ধরে !]
ধ্রুব পরিণতি পাবে একদিন তবু কিছু না-তে ।
অথবা একটু বেশি, আরো কিছু অকিঞ্চিৎকর
সর্ব গর্ব ঝরে যাবে হেমন্তের পাতার মতন
অন্তিম প্রশ্বাস থেকে লঘু হবে ওজনের ভর
তারো চেয়ে, সর্বশেষ যে নিঃশ্বাসে সমাপ্ত জীবন ।
তখন পৃথিবীপতি অসহায় ঝরা ফুল যেন
আত্মাভিমানীর পক্ষে এটি জেনো, নীতির শিক্ষণ ;
পুঁথির কবরক্ষেত্রে গ্রন্থকীট হয়ে রোমন্থনে
কাটাবে যখন বসে এই কথা ভেবো মনে মনে
ধ্রুব পরিণতি পাবে একদিন করোটিতে হেন !
চেয়ে দেখ—এই নাকি 'মানুষের স্বর্গীয় আনন' !

'It is a most humiliating thought.'

রোমিও-জুলিএট

দুজনের পরিণতি মনে ভেবে দু চোখ আনত
হয়েছিল অশ্রুভারে, তারপর রাত্রি এল নেমে,
প্রেমের প্রহর সে তো, প্রত্যাশায় অন্তর উদ্যত
তরুণ-হৃদয়ে স্বপ্ন, আশীর্বাদ প্রথমার প্রেমে ।

দয়িতের মধুঝরা কণ্ঠস্বর শুনেছে কেমন
রূপবতী জুলিএট ; বিদায়ের ম্লান সম্ভাষণে
স্নিগ্ধস্বরে কেন তাকে ফিরে-ফিরে ডেকেছে এমন ?
কেন যে ডেকেছে ফের !   প্রেম সমদর্শী সর্বজনে
অবশ্যই, বুকে তবু সর্বগ্রাসী আগুনেরই বেড়া—
আবেগে উন্মুখ হয়ে, তীব্র জ্বলে লেলিহান রেখা,
জীবনের উপহার যতখানি হতে পারে সেরা
তারো চেয়ে বেশী দামী, আমাদের যত কিছু দেখা
স্বপ্নে কিংবা জাগরণে যতটুকু দর্শন সম্ভব
প্রণয়ের স্বর্গলোক, শুধু যার স্বপ্নে অনুভব !

'I thought upon their fate and wept.'

বৌদি

লক্ষ্মী সোনা বোনটি আমার বৌদি পাবার বায়না তোর
স্বর্গলোকের একটি তারা আনব আমি দেখিস ঠিক
সেই তারা তোর বৌদি হবে, পূজোর প্রদীপ মাঙ্গলিক
তোর মতনই সেও যে হবে, ধূপের দামী গন্ধে ভোর !

ইন্দ্রপুরীর আলোক যখন ঝড়ের রাতে ম্লান ধীরে
ঘুম-পরীদের পাখায় চড়ে উধাও হব কল্পনায়—
স্বর্গদূতের মতন যাব ইন্দ্রধনুর এক কোণায়,
সপ্তরঙের একটি কণা, মর্ত্যে সে তোর বৌদি রে—

প্রবাল গুহার আঁধার যখন আমার আলোয় স্বর্ণময়
জলপরীদের কাজল-বেণী ভিজিয়ে দেবে ঢেউয়ের জল
গলায় তখন সাগর-রাণীর মুকুট-ঝরা মুক্তোফল
ঝুলিয়ে নেব আঁধার ভেঙে ; বৌদি সে তোর, মুক্তো নয় !

চন্দ্র-মাতাল অপ্সরাদের পাখায় যদি যাই তবে
কল্পলোকের জাদুর মায়ায় বিশ্বজগৎ প্রদক্ষিণ
করব তখন – যে পারিজাত গন্ধে মাতায় নিত্যদিন
আনব তাকে স্বর্গ থেকে ; বৌদিদি তোর সেই হবে !

'A sister-in-law, my sister dear…'

উপেক্ষিতা

স্বপ্নরা ছিল উজ্জ্বল কত কোথায় হারাল তারা
কত সুন্দর ভাবনারা সব নেই আর তারাও তো
ইন্দ্রধনুর রঙের মতন সব আশা দিশাহারা
চঞ্চল পায়ে অস্তরবির আলোর ছটার মত।
হেমন্ত-শেষে ঝরাপাতা যেন আমি একা পড়ে আছি
পৃথিবী এখন করুণাশূন্য বেদনায় ভরপুর
কাটবে জীবন, ভবিষ্যতের যে-কটা বছর বাঁচি
হে মীনকেতন, বয়ে নিয়ে চল যেতে পার যতদূর,
বয়ে নিয়ে চল আমার হৃদয় গঙ্গা যেখানে লীন ;
আমার সুখের ভরা বসন্ত ছিল সামান্য দিন ॥

'My dream was bright but it past away.'

স্তোত্র : ১

আকাশের মরকতবর্ণ সিংহদরজার ওপারে,
যেখানে বিদেহী সত্তারা অদৃশ্য পাখ্‌নায় ভর করে
ভেসে বেড়ায়—তারো ওধারে,
আমাদের স্তোত্র রণিত হল প্রেম আর প্রশস্তির মধ্যে।

তুষারের শয্যা ছেড়ে বাতাস উঠেছে—
উঠেছে সমস্ত রাত্রির স্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে,
অলক্ষ্যে কখন বহুদূর চলে গেল সে আবার
এক খুশী-হওয়া দেবতার মতন !
সকালটুকু, এই সকালটুকু, এই শিশুর মতন
সকালটুকু ব্যস্ত হয়ে পড়েছে
তার কাজ সমাপন করতে। আর আমরা,
এই শিশিরের জহরতে মোড়া পর্বতভূমির
অধিবাসীরা, পৃথিবীর সমস্ত কলরোল থেকে
নিশ্চিন্ত এক দূরত্বে রয়েছি।

অনন্তের সেই কমলাসন রাজচক্রবর্তীর পায়ের ওপরে
আছড়ে-আছড়ে পড়ছে আমাদের প্রেম আর প্রশস্তি ঃ
এই পর্বতশৃঙ্গে এ যেন এক মহামূল্যবান্ উপহার,
যেন বিদেহীর পক্ষশব্দে অনুরণিত একটা কোলাহল
ঐ বহমান স্রোতোস্বিনী যেন স্বর্গীয় জহরতে
ঝল্‌মলে হয়ে মর্ত্যভূমির দিকে
যাবার একটা পথ খুঁজে পেয়েছে,
যেন সে নিঃশব্দে বন্ধন ভেঙে ফেলে
উজ্জ্বল পর্বতচূড়াকে বয়ে চলেছে।

এই নিঃঝুমে কি কোনো শব্দই নেই,
হৃদয়কে যা আরো শান্ত কোনো মর্জিতে
শোনাবে সযত্নে স্বস্তির জগতের বাণী ?
শোনাবে সেই মহাকাশের মহা-ইরম্মদের
ওপারের জগতের কথা,
স্তোত্র শোনাবে প্রণয় ও প্রশস্তির—
সেই এক শাশ্বতের ঈশ্বরের প্রতি যা নিবেদিত ?

বহমান বাতাসে যেন কার কণ্ঠস্বর
দৈবাদেশের মতন—যেন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ওপর

ঝঞ্ঝা সঞ্চরমান, কিংবা যেন সে মাটির ওপরে
পাগলের মতো আর্তনাদ করে-করে উঠছে।
পাহাড়িয়া গাছগুলির চিরন্তনী শ্যামলী সজ্জায়
এক দৈবী-করস্পর্শ : এক মহামননের পরিকল্পনে
সব কিছু দেখা।

ভূমণ্ডলের কি নভস্তলের যারা অধিবাসী,
যারা সমুদ্রের অতলগুহার অদৃশ্য প্রত্যন্তে রয়েছে,
যেখানে সাগরের প্রেতাত্মারা ঘুমায়,
সেখানে স্বনিত হচ্ছে এক স্বস্তিবচন :
সেই তিনি, যিনি দিনমণিকে সম্মত করান
তাঁর স্বর্ণিল কেশরাশি থেকে সম্পন্ন-আশিস্
ঝরাতে, যাঁর আদেশে পৃথিবীর লোভন বুকে
ফুটে ওঠে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যনিচয়, যাঁর নির্দেশে
হিমবন্ত পর্বতরাজি বহন করে মহাপুণ্যের মহাভার
নিজেদের প্রশস্ত স্কন্ধে,
যিনি নক্ষত্রসংঘ জীবমান হয়ে উঠলে
তাদের রথবর্ত্ম নির্দিষ্ট করে দেন,
যিনি প্রতিবেশে
অবলীনে
এবং
নভোদেশে
বিরাজিত—
তিনিই চিরন্তনকাল প্রশস্তি এবং প্রণয়ের
অসপত্ন-অধিকারী, শুধু তিনিই ॥

'Beyond the sapphire gates of the sky.'

স্তোত্র ঃ ২

নাকড়া বাজুক আর এই মুহূর্তে
চারিদিকে পুষ্পবৃষ্টি হোক
সুগন্ধী-অগুরু ধূপে আসন্ন সেই
বিসর্জনের বোধন হোক।
সুরভিত চূয়া আনো গন্ধে মো-মো-করা
নিয়ে এস সুবাসী চন্দন
অনুমৃতা হবে যে নারী সূর্যাস্তের প্রাক্‌কালে
তার পবিত্র নিঃশ্বাসের মতো সুরভিত হোক হোক এই সব।
পবিত্র সৌরভ হোক হৃদয়ের
উত্তপ্ত-বাসনার মতো গগন-বিহারী
বাসনা আর সৌরভেরা উঠে যাক
বিশ্বপিতার পদ্মপাপড়ির সিংহাসন অবধি,
আমাদের সর্বনিয়ন্তা সেই মহতোমহীয়ানের
কাছ অবধি পৌছক সেখানে।
নিয়ে এস সবচেয়ে পবিত্র আর শুভ্র
মুক্তাটিকে ; আন উজ্জ্বলতম হীরকখণ্ডটিও,
নিয়ে এস শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য,
যা তুমি দিতে পার,
আন, আরো আন
স্বর্ণ আর গজদন্তে সুশোভিত
ময়ূরপুচ্ছের চামর।

পূতচেতার আহত হৃদয়ের মতো
সৌরভ-বিস্তারা চন্দনখণ্ড এনে দাও—
মনে রেখ—
পবিত্রপুরুষের হৃদয়ের ঐ আঘাতই
তাঁর গর্ব, তাঁর জয়,
চূড়ান্ত আঘাতেই তাঁর সমস্ত মাধুর্য বিলীন।

স্বর্ণবর্ণ সবিতৃদেব বিদায় নেবার আগে
এই সব অমূল্য উপহার নিয়ে এস,
নিয়ে পৌছতেই হবে
অদূরের পবিত্র হরিদ্রাভ ঢেউগুলি
তাঁর মহান ললাট স্পর্শ করার আগে

বাতাসের প্রদেশে উন্নীত হয়ে চলার সময়
এই পতিহীনার প্রার্থনা যেন তিনি শোনেন—
ত্বরা কর, আরো ত্বরা, দিন পড়ে আসে ঃ
কাজে আগুয়ান হও, যতক্ষণ সবিতৃদেব থাকেন
হাসিমুখে, তার মধ্যে। আর আমরা
সেই উপাস্থ দেবতার
মহিমা উপলব্ধি করি।
নিজেদের পরিশ্রমের মাধ্যমে ॥

'Scatter Rcatter flowerets round'

ঝড়ের পরে ঃ ভোর

তখনো ওঠেনি সূর্য, লীন বিশ্ব ছিল স্তব্ধতায়
প্রদোষের পথে নেমে প্রকৃতিকে দেখেছি নিস্প্রাণ,
তখন পাইনি আমি পুষ্পগন্ধে ভোরের আঘ্রাণ
দেখিনি দু-চোখ মেলে প্রভাতের বালার্ক-আভায়।
ঝড়ের বিধ্বংসী রূপে প্রকৃতির শক্তি অবলীন
দেখেছি দু-চোখ জুড়ে ভোরে-ভরা দিকচক্রবালে
ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্যে, বিপর্যস্ত ধ্বংসের জঞ্জালে
ছোট সেই গ্রাম ছিল স্তব্ধ এক বিষাদে-বিলীন।
শাল-তাল-তমালের ছোট-বড় ডালপালাগুলি
ঝড়ের চাবুক খেয়ে ছড়িয়ে, লুটিয়েছিল সব,

দক্ষিণের দীর্ঘশ্বাসে যে রকম আকুলি-বিকুলি
ঝর্ণা-জলে ভেসে যায় হেমন্তের বিষণ্ণ পল্লব !
মেঘে মেঘে মূর্তিমন্ত আঁধারের দৈত্যরা স্বপ্নিল,
বিচিত্র, কী অপরূপ—স্তব্ধ মেঘে কি যেন সন্ধানে
আলো-না-ফোটার আগে, আঁধারের স্বপ্ন ঝিলমিল্
তারপরে ভেঙে গেল, ছড়িয়ে মিলিয়ে কোনখানে !

'The elements were all at peace···'

ঝড়ের পরে ঃ বেলা

আহা রে, প্রকৃতি তুই ! তাজা ওই মুখখানি তোর
বড় ভালবাসি আমি ; তোর ওই ভ্রূযুগে অক্ষয়
সতেজ পবিত্র ভাব, মুগ্ধ চোখে দেখিরে বিভোর
পরম তৃপ্তির সঙ্গে ; এই দৃশ্যে আমার হৃদয়
উচ্ছ্বসিত হয়েছিল, ভরেছিল স্বর্গের প্রহর।
গোলাপের মৃদুবাস স্বর্গঝরা মালার মতন,
ঝড়ের পরুষস্পর্শে এলোমেলো ঝর্ণার লহর,
স্রোতের প্রশান্ত ঢেউ, কিশোরীর শান্ত স্নিগ্ধ স্তন
তখন বিরামে লীন, ওপাশে ঘাসের বনে একা
ছেলেমানুষের মতো নুড়িগুলো ছুঁড়েছি কখন
ঝর্ণার উচ্ছল জলে আবর্তিত কম্পমান রেখা
হঠাৎ মিলিয়ে গেল, বুঝলাম চকিতে তখন
সে এক শাশ্বত সত্য—যে সম্পদ রইবে অম্লান
মনের গভীর কক্ষে, উদ্ভাসিত আলোর সন্ধান।

'Oh ! Nature, how I love thy face···'

স্বল্পস্থায়ী জীবনের মধ্যে মাত্র দু'খানি কবিতার বই প্রকাশ করতে পেরেছিলেন ডিরোজিও। এদের বাইরেও তাঁর অজস্র লেখা ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে যা এখনো খুঁজে পাওয়া যায় তার থেকেই এই কবিতাগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে। ডিরোজিওর কাব্যের মূল সুরগুলির সব কটিই এদের মধ্যে শোনা যায়। স্বদেশ-চেতনা, মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষা, শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভীপ্সা, রোমান্টিক বিষণ্ণতা, জীবন-মৃত্যুর রহস্যময়তার উপলব্ধি, সমাজ-সচেতনতা প্রভৃতি সমস্ত দিকই এই নির্বাচিত কবিতাগুলির মধ্যে উদ্ভাসিত।

এডুকেশ্যন ইন ইণ্ডিআ

'ক্যালকাটা মান্থলী জর্নালে' প্রকাশিত 'টোর্ন-আউট লীভ্স অব এ স্ক্র্যাপ বুক' শিরোনামের এক নিবন্ধমালার ৩য় কিস্তিতে এই লেখাটি বেরোয় ১৮২৬ সালের আগস্ট মাসে। অ্যাংলো-ইণ্ডিআনদের শিক্ষাব্যবস্থা উপলক্ষে নিবন্ধটি লেখা হলেও, সাধারণভাবে এদেশে তখনকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কেই তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় এতে। দেড়শ বছরেরও বেশি সময় কেটে যাবার পর এটি সর্বপ্রথম সংকলিত এবং পুনর্মুদ্রিত হল এই বইতে।

থটস অন ভেরীআস সাবজেকটস

'ক্যালকাটা লিটেরারী গেজেটে' ১৮৩৫ সালের ৩ জানুআরী তারিখে এই নিবন্ধিকাগুলি প্রকাশিত হয়। এগুলিও সর্বপ্রথম পুনর্মুদ্রিত হল এখানে। লেখাগুলি খুব সম্ভবত ডিরোজিওর দিনপঞ্জী বা ডাআরির ছিন্নপত্র-জাতীয়। প্রথম প্রকাশের সময় এদের উৎস-সম্বন্ধে কোনো হদিশ দেননি পত্রিকা-সম্পাদক। ডিরোজিওর ব্যক্তিগত জীবনেরও কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায় এদের মধ্যে।

'অ্যাকনলেজমেণ্ট অব এররস' নিবন্ধিকাটির মধ্যে নিজের ভুল অকপটে স্বীকার করার মতো ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের নূতন একটি দিকও এর মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে।

'ডেফিনিশ্যনস' শিরোনামের সংক্ষিপ্ত লেখাটিই এই গুচ্ছের মধ্যে একমাত্র তারিখবিহীন। তবে অন্যান্য লেখাগুলির তারিখের সঙ্গে মিলিয়ে এটিকেও ১৮২৯ সালের শেষার্ধে কিংবা ১৮৩০-এর প্রথমার্ধেই লেখা বলে গণ্য করা যায়।

'টাইটলস' যুক্তিনিষ্ঠ অধ্যাপক এই তরুণ পণ্ডিতের মধ্যেও যে একটা আবেগপ্রবণ ভাবুক মন ছিল তার পরিচয় দেয়। এই লেখাটির মধ্যে তাঁর কবি মনের প্রকৃত উৎসটিরও সন্ধান মেলে।

'লক'স স্টাইল অ্যাণ্ড রিজনিং'-এর মধ্যে নিজের কিশোর ছাত্র রামগোপাল ঘোষকে যেভাবে প্রশংসা করেছেন ডিরোজিও, সেখানেই প্রকাশিত হয়েছে

'ইঅং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর যথার্থ জোরটার উৎস ও স্বরূপ। মাত্র দু'বছর আগে ইংরেজী শিখতে আরম্ভ করেই ১৫ বছর বয়সের ছেলে রামগোপাল লকের মতো মনীষী সম্বন্ধে অতখানি মৌলিক কথা বলেছিলেন ডিরোজিওর শিক্ষণের কৃতিত্বেই যে, তাতে সন্দেহ নেই।

'হিউম্যান অ্যাকশ্যন' নিবন্ধিকায় ডিরোজিও আদর্শ-নিষ্ঠাই যে মানুষের চরিত্রে এবং সমাজে অন্যায়কে কমিয়ে আনে, এমন মন্তব্য করেছেন। বস্তু, মানুষ এবং সক্রিয়তার পারস্পরিক সম্পর্কগুলিও এই ছোট্ট অনুচ্ছেদটির মধ্যেই সুপটুভাবে বিশ্লেষিত।

'দি গ্রীকস, অ্যাণ্ড হোআট উই হ্যাভ রিসিভড ফ্রম দেম' লেখাটিই হল একমাত্র, যা এই রচনাগুলির মধ্যে একটা পুরো প্রবন্ধের (যদিও ছোট মাপের) মর্যাদা দাবী করতে পারে। গ্রীস এবং গ্রীক জাতির ইতিহাস ও শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে ডিরোজিওর গভীর অনুধ্যান এবং শ্রদ্ধার কথা এই বইতে আলোচিত হয়েছে। 'গ্রীক' পর্যায়ের কবিতাগুলির ভাবগত পরিপূরক হিসেবেই এটিকে গণ্য করতে হবে। ছোট্ট এই লেখার মধ্যে সংস্কৃতির ইতিহাসে গ্রীক সভ্যতার অবদান কি, সেটা চমৎকারভাবে বোঝানো হয়েছে।

'কনক্লুশ্যন টু মাই অ্যাড্রেস টু মাই স্টুডেণ্টস বিফোর দি গ্র্যাণ্ড ভ্যাকেশ্যন ইন ১৮২৯' বলতে গেলে টু মাই পিউপিলস ইন দি হিন্দু কলেজ' কবিতাটিরই গদ্য রূপায়ণ। জ্ঞানের চর্চা এবং মানবপ্রেমেই যে জীবনের সার্থকতা, সে কথা এর মধ্যে ডিরোজিও বলেছেন। তাঁর সাধনার মূল স্বরূপটি এই ছোট্ট লেখাটির মধ্যে সন্নদ্ধ হয়েছে।

অন মর্যাল ফিলজফি

মোপার্তুই-এর এই লেখাটির অনুবাদ ডিরোজিও করেছিলেন সম্ভবত হিন্দু কলেজে অধ্যাপনার প্রয়োজনে। অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল 'ক্যালকাটা কোআর্টারলি ম্যাগাজিন অ্যাণ্ড রিভিউ' পত্রিকার ১৮৩৩ সালের ২য় সংখ্যায়। শিরোনামের তলায় বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল 'ট্রানস্লেটেড বাই দি লেট এইচ. এল. ভি. ডিরোজিও ফ্রম দি ফ্রেঞ্চ, অব এম. মোপার্তিয়াস'; স্পষ্টতই 'Maupertuis'-এর পরিবর্তে মুদ্রণ-প্রমাদে 'Maupertius' ছাপা হয়েছিল।

তিন অধ্যায়ে বিভক্ত এই বিরাট আয়তনের প্রবন্ধটির মধ্যে ডিরোজিও দর্শন ও বিজ্ঞানের কোন্ কোন্ অনুভাবনায় প্রভাবিত ছিলেন তার একটা সুন্দর পরিচয় মিলবে। 'হোআট ইজ হ্যাপিনেস অ্যাণ্ড হোআট ইজ মিজারী' অংশে সুখ ও দুঃখের উৎস সম্বন্ধে মোপার্তুই যে হদিশ দিয়েছেন এবং ভাল ও মন্দের যথার্থতা নির্দিষ্ট করেছেন, ডিরোজিওর কবিতার মধ্যে তারও ছায়া পড়েছে। 'ইন অর্ডিনারী লাইফ, দি সাম অব ইভিল এক্সীডস ছ্যাট অব গুড' আপাত-বিচারে হতাশাদ্যোতনার সূচক বলে মনে হলেও এই পরিচ্ছেদের শেষ পংক্তিতে মানুষের সাধনার মূল্য প্রাপ্তির কথা সে সন্দেহের নিরসন করে। ডিরোজিওর কবিতার মূল সত্য রূপটি সম্পর্কেও ঐ একই ভ্রান্তি বহু সময়েই হতে পারে; কিন্তু সেখানেও শেষ বিচারে এখানের অনুরূপ সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে হয়। এদিক থেকে ডিরোজিওর সৃষ্টির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এই লেখাটির গুরুত্ব আছে বিশেষ-ভাবে। 'রিফ্লেকশ্যনস অন দি নেচার অব প্লেজার অ্যাণ্ড পেনস' অংশে আনন্দ-বেদনার অস্তিত্ব দেহে ও মনে কতখানি, তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'দি পোএট্রি অব হিউম্যান লাইফ' কবিতাতেও এই দৃষ্টিভঙ্গীর ছাপ দেখা যায়।

হিন্দু উইডো

'দি ফকীর অব জঙ্গীরা' কাব্যের ১ম সর্গের ১০ম স্তবকের ১৬শ-১৭শ চরণের টীকা হিসেবে লেখা একটি দীর্ঘ বক্তব্যের অংশ হল এই নিবন্ধিকাটি। প্রাসঙ্গিক চরণ দুটি হল ঃ

> "Ye who in fancy's vision view the fires
> Where the clam widow gloriously expires."

'অন দি অ্যাবলিশ্যন অব সতী' কবিতাটির ভাব ও প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে এই লেখাটি বিশেষভাবে তুলনীয়॥

ভারত আমার, স্বদেশ আমার

মূল কবিতাটি হল 'টু ইণ্ডিআ মাই নেটিভ ল্যাণ্ড'; প্রকাশকাল ১৮২৮ সাল। 'দি ফকীর অব জঙ্গীরা' কাব্যের মুখবন্ধ হিসেবে লেখা। এই কবিতার দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি অনুবাদ করেছিলেন; ঐ অনুবাদটি রাজনারায়ণ বসুর 'একাল আর সেকাল' গ্রন্থে সংকলিত আছে।

আমার দেশের বীণা

মূল কবিতাঃ 'দি হার্প অব ইণ্ডিআ'; প্রকাশকাল মার্চ, ১৮২৭। 'পোএমস' গ্রন্থের অন্তর্গত এই কবিতাটিকেই এদেশের প্রথম দেশপ্রেমাত্মক রচনা বলে গণ্য করতে হয়।

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশে

১৮২৮ সালে প্রকাশিত এই কবিতাটির মূল 'শিরোনাম 'সনেট টু দি পিউপিলস অব দি হিন্দু কলেজ'।

সনেট ঃ ডেভিড হেআরের অনুরাগীদের প্রতি

মূল শিরোনাম ঃ 'সনেট—টু দোজ হু অরিজিনেটেড অ্যাণ্ড ক্যারেড ইনটু এফেক্ট দি প্রপোজাল ফর প্রোকিউরিং এ পোর্ট্রেট অব ডেভিড হেআর, এস-কোঅ্যার'; প্রকাশের তারিখ ৮ মার্চ, ১৮৩০। যে ছবিটির উপলক্ষে এই কবিতা লেখা হয়েছিল সেটিই বর্তমানে হেআর স্কুলে রয়েছে বলে মনে করা হয়ে থাকে।

সতী-প্রথা বিলোপে

মূল নাম ঃ 'অন দি অ্যাবলিশ্যন অব সতী'; তারিখ ঃ ডিসেম্বর, ১৮২৯। এই কবিতার শুরুতে ঐ বছরে ৪ ডিসেম্বরে বিধিবদ্ধ সতী-প্রথা-নিবারণ আইনের ১৭শ তম ধারাটি উদ্ধৃত করা আছে ঃ "সতী-প্রথা অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় চিতারোহণ করে কিংবা সমাধিস্থ হয়ে হিন্দু বিধবাদের মৃত্যুবরণ করা এখন থেকে বেআইনী এবং দায়রা আদালতের দ্বারা শাস্তিযোগ্য বলে গণ্য হল।"

জীবনের গান

মূল নাম : 'দি পোএট্রি অব হিউম্যান লাইফ'। ১৮৩৪ সালে ডি. এল. রিচার্ডসন-সম্পাদিত বার্ষিক সংকলন 'বেঙ্গল অ্যানুআল অ্যাণ্ড লিটেরারী কীপসেক' পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও, ডিরোজিওর কবিতার কোনো সংকলন গ্রন্থেই এটি স্থান পায়নি—অজ্ঞাত কারণে।

স্বাধিকার

মূল নাম : 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স', প্রকাশকাল ১৮৩২। ঐ বছরের জানুআরী মাসে 'ওরিএন্ট পার্ল' সংকলন গ্রন্থে [সম্পাদক : ডি. এল. রিচার্ডসন] এটি প্রকাশিত হয়। এটিও পরবর্তী সময়ে কোনো সংকলনে গ্রন্থিত হয়নি বটে, তবে টমাস এডোআর্ডসের 'হেনরী ডিরোজিও' [১৮৮৪] বইতে মুদ্রিত হয়েছে।

ক্রীতদাসের মুক্তি

'ফ্রীডম টু দি স্লেভ' নামের মূল কবিতাটি ১৮২৭ সালের ফেব্রুআরীতে প্রকাশিত। মুখপাতে উদ্ধৃত ইংরেজ কবি টমাস ক্যামবেলের লেখা চরণটির অনুবাদ : "বিদায় নিতেই দাস, ফিরে এল মানুষ আবার !"

প্রত্যাশা

ডিরোজিওর যে সমাধি-ফলকটি হারিয়ে গিয়েছে অনেক বছর আগে, তার ওপরে মূল কবিতাটি উৎকীর্ণ ছিল। বর্তমানের ফলকটিতে এই কবিতা নেই।

আমার সমাধি

'পোএট'স গ্রেভ' ছিল মূল কবিতার শিরোনাম। রচনাকাল মার্চ, ১৮২৭। এই একই নামে ডিরোজিওর আরো একটি কবিতা আছে, যেটি সাময়িকপত্রের বাইরে সংকলিত হয়নি। এই কবিতার 'কবির সমাধি' নামে একটি অনুবাদ নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'বাঙালী কবির ইংরেজী কবিতা' গ্রন্থে সংকলিত আছে। ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত সমাধি ফলকে, এর শেষাংশ উৎকীর্ণ হয়েছে।

ধুলো

মূল নাম : 'ডাস্ট'; রচনাকাল : এপ্রিল. ১৮২৮।

কবর

'দি টুম' নামে ১৮২৬ সালের মে মাসে প্রকাশিত।

করোটি

মূল নাম ছিল 'ইয়োরিক'স স্কাল'; প্রকাশকাল: এপ্রিল ১৮২৭। এর শুরুতে শেকসপীআরের 'হ্যামলেট' নাটক থেকে যে কয়েক ছত্র সংলাপ উদ্ধৃত করা হয়েছে কবিতাটির মুখবন্ধ রূপে, তার অনূদিত রূপ:

বিদূষক: যুবরাজ, এটা হল—সেই যে দরবারের ভাঁড় ছিল ইয়োরিক—
তারই মাথার খুলি।

হ্যামলেট
[করোটি নিয়ে]: এইটে?

বিদূষক: যে আজ্ঞে।

হ্যামলেট: হায় রে! বেচারা ইয়োরিক!

... ...

আমার প্রণয়িণীর কাছে গিয়ে বল যে, যতই কেননা দু-আঙুল পুরু করে ও মুখে রঙ মাখুক—এই হল শেষ পরিণতি। ও যেন একথা শুনে টিট্‌কিরি দিয়ে ওঠে!

রোমিও জুলিএট

'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিএট' নামের মূল কবিতাটি ১৮২৭-এর এপ্রিলে প্রকাশিত হয়। এর শুরুতে বাইরনের 'ডন জুআন' কাব্যের ৩য় সর্গের ২য় গুচ্ছ থেকে যে দুটি চরণ উদ্ধৃত করা হয়েছে তাদের অনুবাদ:

'হায় প্রেম! এই প্রিয় মর্ত্যভূমি ফেলে
চলে যেতে হয় কেন, ভালবাসা পেলে!'

বৌদি

মূল নাম: 'সিস্টার-ইন-ল'; প্রকাশের বছর ১৮২৮। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কাব্যসঞ্চয়ন' গ্রন্থে 'বৌদিদি' নামে এই কবিতার একটি অনুবাদ সংকলিত হয়েছেন।

উপেক্ষিতা

মূল নামঃ 'সং অব দি ইণ্ডিআন গার্ল'; প্রকাশকালঃ জানুআরী, ১৮২৭। ঐ 'কাব্যসঞ্চয়ন' বইটিতে এরও অনুবাদ সংকলিত আছে 'বালবিধবা' নামে।

স্তোত্র ঃ ১

'এ ড্রামাটিক স্কেচ' কাব্যসংলাপটির প্রথম অংশের খানিকটা এখানে অনূদিত হয়েছে; এর রচনার কাল অনিশ্চিত; পরবর্তীকালে যখন সংকলিত হয়েছে এটি, তখন রচনাকালের উল্লেখ করা হয়নি। এই অংশটি পড়লে হঠাৎ ডিরোজিওকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী বলে মনে হতে পারে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি তা ছিলেন কি-না নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তাঁর বস্তুবাদী মনের পরিচয় যেভাবে রচনার সর্বত্রই দেখা যায়, তাতে করে বরং তার বিপরীতটাই সঠিক বলে মনে হয়। আসলে একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ হওয়ার ফলে এখানে এই রকম মনে হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ কাব্যটির প্রত্যয় অন্য ধরণের ঃ একান্তই জীবনবাদী ও বস্তুমুখিন।

স্তোত্র ঃ ২

'দি ফকীর অব জঙ্গীরা'-র ১ম সর্গের ৮ম কবিতা এটি ঃ 'কোরাস অব ব্রাহ্মণস'; নলিনীকে চিতায় অনুমৃতা হবার জন্য নিয়ে যাবার প্রাক্কালে এটি গীত হয়েছিল। অগের কবিতাটির মতো এটিও একটি বড়ো আকারের পূর্ণাঙ্গ কাব্যের অংশবিশেষ হবার ফলে, এর মধ্যেও আপাতভাবে আস্তিকতা প্রতি-ভাসিত হয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে কাব্যটির অন্তর্লীন ব্যঞ্জনা নয়।

ঝড়ের পরে ঃ ভোর

'মর্নিং আফটার এ স্টর্ম' নামে একটি কবিতার প্রথমাংশ এটি। রচনাকাল ঃ এপ্রিল, ১৮২৭।

ঝড়ের পরে ঃ বেলা

ঐ কবিতারই দ্বিতীয় অংশ এটি ॥

পরিশিষ্ট

ডিরোজিওর পূর্ণায়ত মূল্যায়ন এবং অবদান প্রসঙ্গে কয়েকটি দলিল এখানে সন্নিবিষ্ট করা হল। হিন্দু কলেজের পরিচালক-মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী ডিরোজিও আনুষ্ঠানিক পদত্যাগ পত্র পেশ করবার পরে হোরেস হেম্যান উইলসনের কাছে নিজের বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর জীবন-পর্যালোচনা এবং মন ও ব্যক্তিত্বের মূল্য নিরূপণে এই চিঠিটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ডিরোজিওর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে'র উত্তরসূরী হয়ে যে 'সোসাইটি ফর অ্যাকুইজিশ্যন অব জেনারেল নলেজ' প্রতিষ্ঠা হয়, তারও একটি অনুষ্ঠানপত্র এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে সন্নদ্ধ করা গেল। ডিরোজিআন বলে যাঁরা খ্যাত, পরবর্তীকালে তাঁরা কোন্ ভাবনা-চিন্তায় প্রবুদ্ধ হতেন, তার পরিচয় পাওয়া যাবে এতে। এই দেড়শ বছর ধরে ডিরোজিওর স্মৃতিরক্ষার জন্য যে-সব প্রয়াস হয়েছে, তার তথ্য সংবলিত কয়েকটি সংবাদ এবং দলিলও সন্নিবিষ্ট হল এই সঙ্গে ॥

ক উইলসনকে লেখা ডিরোজিওর ঐতিহাসিক চিঠি ; ডিরোজিওর আত্মসমীক্ষণ

H. H. Wilson, Esq. 20th April, 1831

My Dear Sir,

Your letter, which I received last evening, should have been answered earlier but for the interference of other matters which required my attention I beg your acceptance of this apology for the delay, and thank you for the interest which your communication proves that you continue to take in me. I am sorry, however, that the questions you have put to me will impose upon you the disagreeable necessity of reading this long justification of my conduct and opinions. But I must congratulate myself that this opportunity has afforded me of addressing so influrential and distinguished an individual as yourself upon matters which, if true, might seriously affect my character. My friends need not, however be under any apprehension for me; for myself the concious-ness of sight is my safeguard and my consolation.

I. I have never denied the existence of a God in the hearing of any human being. If it be wrong to speak at all upon such a subject, I am guilty; but I am neither afraid, nor ashamed to confess having stated the doubts of philo-sophers upon this head, because I have also stated the solution of these doubts. Is it forbidden anywhere to argue upon such a question? If so, it must be equally wrong to adduce an argument upon either side. Or is it consistent with an enlightend nation of truth to wed ourselves to only one view of so important a subject, resolving to close our eyes and ears against all impressions that oppose themselves to it?

How is any opinion to be strengthened but by completely comprehending the objections that are offered to it, and exposing their futility? And what have I done more than this? Entrusted as I was for sometime with the education of

youth peculiarly circumstanced, was it for me to have made them part and ignorant dogmatists, by permitting them to know what could be said upon only one side of grave questions? Setting a side the narrowness of mind which such a course might have been evinced, it would have been injurious to the mental energies and acquirements of the youngmen themselves. And (whatever may be said to the contrary) I can vindicate my procedure by quoting no less orthodox authority than Lord Bacon: "If a man," says this philosopher (and no one ever had a better right to pronounce an opinion upon such matters than Lord Bacon) "will begin certainties he shall end in doubt. "This, I need scarcely observe, is always the case with contented ignorance when it is roused too late to thought. One doubt suggests another, and universal scepticism is the consequence. I therefore thought it my duty to acquaint several of the College students with the substance of Hume's celebrated dialogue between Cleanthes and Philo, in which the most subtle and refined arguments agianst Theism are adduced.

But I have also furnished them with Dr. Reid's and Dugald Stewart's more actue replies to Hume,—replies which to this day continue unrefuted. "This is the head and front of my attending." If the religious opinions of the students having become unhinged in consequence of the course I have persued, the fault is not mine. To foroduce convictions was not within my power; and if I am to be condemned for the Atheism of some, let me receive credit for the Theism of others. Believe me, my dear sir, I am too throughly imbued with a deep sense of human ignorance, and of the perpetual vicissitudes of opinion, to speak with confidence even of the most unimportant matters. Doubt and uncertainty besiege us too closely to admit the boldness of dogmatism to enter an enquiring mind; and far be it from me to say "this is," and "this is not," when after the most extensive acquaintance with the researches of science, and after the most daring flights of genius, we must confess with sorrow and disappointment

that humility becomes the highest wisdom, for the highest wisdom assures man of his ignorance.

II. Your next question is, "Do you think respect & obedience to parents no part of moral duty ?" For the first time in my life did I learn from your letter that I am charged with inculcating so hideous, so unnatural, so abominable a principle. The authors of such infamous fabrications are too degraded for my contempt. Had my father been alive, he would repelled the slander by telling my calumniators, that a son who had endeavoured to discharge every filial duty as I have done, could never have entertained such a sentiment ; but my mother can testify how utterly inconsistent it is with my conduct, and upon her testimony, I might risk my vindication. However, I will not stop there, so far from having ever maintained or taught such an opinion, I have always insisted upon respect and obedience to parents. I have indeed condemned that feigned respect which some children evince as being hypocritical and injurious to the moral character ; but I have always endeavoured to cherish the sentient feelings of the heart, and to direct them into proper channels. Instances, however, in which I have insisted upon respect and obediences to parents, are not wanting. I shall quote two important ones for your satisfaction : and as the parties are always at hand, you may at any time substantiate what I say. About two or three months ago Dakhinarunjun Mookerjee (who has made so great a noise lately) informed me that his father's treatment of him had become utterly insupporatable, and that his only chance of escaping it was by leaving his father's home. Although I was aware of the truth of what he had said, I dissuaded him from taking such a course, telling him that much should be endured from a parent, and that the world would not justify his conduct if he left his home without being actually turned out of it. He took my advice, though I regret to say only for a short time. A few weeks ago he left his father's house, and to my great surprise engaged another in my neighbourhood. After he had completed his arrangements with his

landlord, he informed me for the first time of what he has done; and when I asked him why he had not consulted me before he took such a step: "Because", replied he, "I knew you would have prevented it."

The other instance relates to Mohesh Chunder Sing, having recently behaved rudely to his father and offended some of his other relatives, he called upon me at my house with his uncle Umachurn Bose and his cousin Nondolall Sing. I reproached him severely and told him that, until he sought forgiveness from his father, I would not speak to him. I might mention other cases, but these may suffice.

III. "Do you think marriages of brothers and sisters innocent and allowable?" This is your third question. "No" is my distinct reply; and I never taught such an absurdity. But I am at a loss to find out how such misrepresentations as those to which I have been exposed have become current. No person who has ever heard me speak upon such subjects could have circulated these untruths; at least, I can hardly bring myself to think that one of the college students with whom I have been connected could be either such a fool as to mistake everything I ever said, or such a knave, as wilfully to misstate my opinions. I am rather disposed to believe that weak people who are determined upon being alarmed, finding nothing to be frightened at have imputed these follies to me. That I should be called a sceptic and an infidel is not surprising, as these names are always given to persons who think for themselves in religion; but I assure you, that the imputations which you say are alleged against me, I have learned for the first time from your letter, never having dreamed that sentiments so opposed to my own, could have been ascribed to me. I must trust, therefore, to your generosity to give the most unqualified contradiction to these ridiculous stories. I am not a greater monster than most people, though I certainly should not know myself were I to credit all that is said of me. I am aware that for some weeks, some busy bodies have been manufacturing the most

absurd and groundless stories about me, and even about my family some fools went so fat as to say my sister, while others said my daughter (though I have not one) was to have been married to a Hindu young man ! ! ! I traced the report to a person called Brindabone Ghoshal, a poor Brahmin, who lives by going from house to house to entertain the inmates with the news of the day, which he invariably invents. However, it is a satisfaction to reflect that scandal, though often noisy, is not everlasting.

Now that I have replied to your questions, allow me to ask you, my dear Sir, whether the expediency of yielding to popular clamour can be offered in justification of the measures adopted by the Native Managers of the college towards me ? Their proceedings certainly do not record any condemnation of a man's conduct and character to dismiss him from office when popular clamour is against him ? Vague reports and unfounded rumours went abroad concerning me ; the Native Managers confirm them by acting towards me as they have done. Excuse my saying it, but I believe there was a determination on their part to get rid of me, not to satisfy popular clamour, but their own bigotry. Had my religion and morals been investigated by them, they could have had no grounds to proceed against me. They therefore thought it most expedient to make no enquiry, but with anger and precepitation to remove me from the institution. The slovenly manner in which they have done so, is a sufficient indication of the spirit by which they were moved ; for in their rage they have forgotten what was due even to common decency. Every person who has heard of the way in which they have acted is indignant, but to complain of their injustice would be paying them a greater compliment than they deserve.

In concluding this letter allow me to apologise for its inordinate length ; and to repeat my thanks for all that you have done for me in the unpleasant affair by which it has been occassion.

I remain &c.
H. L. V. Derozio.

[Thomas Edwards-এর 'Henry Derozio' গ্রন্থে সংকলিত]

খ. 'The Society for the Acquisition of General Knowledge' সভার অনুষ্ঠান-পত্র : ডিরোজিআনদের আত্মঘোষণা

Countrymen,

Though humiliating be the confession, yet we cannot for a moment deny the truth of the remark so often made by many able and intelligent Europeans, who are by no means inimical to the cause of native improvement, that in no one department of learning are our acquirements otherwise than extremely superficial. We need only examire ourselves in order to be convinced of the justice of the remark. After the ground-work of our mental improvement has been laid in the school, and the school tution seldom does more, we enter into the world and never think of building a solid superstructure. The fate of our Debating Associations, most of which are now extinct, while not one is in a flourishing condition, as well as the puerile character of the native productions that appear in the periodical publications, are lamentable proofs of this sad neglect. If a tree is to be known by its fruits, where, with but one or two solitary exceptions, are the fruits, to which we can point with pride and satisfaction, as manifesting and degree of intellectual energy or extent of learning? We have ever sincerely regretted the want of an institution which should be the means of promoting frequent mutual intercourse among the educated Hindoos, and of exciting an emulation for mental excellence. There is at present no occasion whereby we ever called upon to congregate on an extensive scale, for the purpose of mutual improvement and whence we may receive an impetus for applying ourselves to urseful studies. Is it then not desirable to unite in such a laudable pursuit by which thd bonds of fellowship may be strengthened, the acquisition of Knowledge promoted and the sphere of our usefulness extended?

With a view therefore to create in ourselves a determined and well-regulated love of study, which will lead us to dive deeper than the mere surface of learning and enable us to acquire a respectable knowledge on matters of general, and more especially of local interest, we have thought it expedient to invite you to meet in order to consider the proposal of establishing an institution which in our humble opinion is eminently calculated not only to effect this great end, but likely to promote mutual good feeling and union—an object of no less importance. We cannot, of course within the limits of a circular give a detailed account of the plan we propose to lay before you, but allow us to state the following brief outline.

Such members of the proposed Society as may be willing should undertake to deliver at the meetings written or verbal discourse on subjects suited to their repective tastes at such times as may be previously fixed by them with a view to their convenience and to the degree of research and attention which the subjects may require, and if they should fail without satisfactory reasons to fulfil their pledges, they will be liable to pay a pecuniary fine. The purpose of this circular is to call a general meeting to consider of the propriety of establishing the proposed institution and to arrange the details.

It is at this General Meeting, Gentlemen, that we most earnestly solicit your attendance. We must well aware that the success of a public object like the one we propose must depend on the degree of cordial co-operation we may receive from the members of our community. We cannot believe that in such a cause coldness will be manifested by any person that entertains the least regard for his own improvement or breathes any love for his own Country, and we flatter ourselves with the hope that we shall meet with your hearty support in a proposal, which none can look upon with indifference unless lost to all sense of duty or sunk in apathy. Those who may from circumstances be unable to take an

active share in our proceedings can at least countenance the object by their presence, for which they may be assured of our thanks.

We have through the kindness of Baboo Ramcomul Sen, Secretary to the Sarskrit College, obtained permission to use the Sankrit College Hall for our meeting, where precisely at 7 O' clock P. M. on Monday the 12 March next we earnestly intreat and hope that everyone of you, Gentlemen, will have the goodness to try your best to be present.

Tariney Churn Banerjee,
Ramgopaul Ghose,
Ramtonoo Lahory,
Tara Chand Chukerbuttee,
Rajkrishna Day.

Calcutta, February 20, 1838

* [Selection of Discourses Delivered at the Meetings of the Society for the Acquisition of General Knowledge, Vol. 1, 1940, বইতে সংকলিত।]

গ. ডিরোজিওর স্মৃতিরক্ষা

Condolence Meeting for Derozio

"At a meeting held on Thursday evening, the 5th January, 1832, at the Parental Academic Institution, to consider the propriety of erecting a Monument to the Memory of the Late Mr. H. L. V. Derozio, J. W. Ricketts, Esq. in the chair, the following Resolutions were unanimously passed :

(i) It was moved by Mr. W. Kirkpatrick, and seconded by Mr. M. Crow :

That the Meeting is desirous of recording its sense of the loss which our Community has recently sustained by the death of Mr. H. L. V. Derozio, whose short but brilliant career of public usefulness has left a chasm in our ranks not easily to be filled up.

(ii) It was moved by Baboo Mohesh Chunder Ghose, and seconded by Mr. Wale Byrn :

That a Stone Monument, bearing an appropriate Inscription be erected by public subscription, to the late Mr. Derozio, as a testimony of our esteem for the Memory of one whose lose we have so much reason to deplore.

(iii) It was moved by Mr. J. A. Lorimer, and seconded by Baboo Kristna Mohuna Banerjee :

That a Committee, consisting of the following gentlemen, Messieurs Wale Byrn, A. Desouza, W. R. Fenwick, D. Hare, D. M. King, W. Kirkpatrick, J. W. Ricketts and J. Welch, and Baboos Dukhin Ununda Mookerjee and Kristna Mohuna Banerjee be appointed to carry the foregoing Resolution into effect, and that W. R. Fenwick be requested to officiate as Secretary to the Committee.

(iv) It was moved by Mr. L. Frasen and seconded by Mr. J. A. Lorimer :

That any surplus which may be left from the subscription raised on account of the Monument, be tendered to the family of the late Mr. Derozio.

On a letter being read by Mr. Byrn from Mr. Stapleton,

offering to publish a Lithographic Miniature of Mr. Derozio, in aid of the Funds, without any remuneration for his labour.

(v) It was moved by Baboo Kristna Mohuna Banerjee, and seconded by Mr. R. Dias.

That Mr. Stapleton's proposal be accepted, and a Miniature of Mr. Derozio be published in Lithography, with the consent of his family, and that the thanks of the Meeting be presented to Mr. Stapleton for his disinterested offer.

(vi) It was moved by Baboo Kristna Mohuna Banerjea and seconded by Mr. R. Dias.

That the thanks of the Meeting be given to the Managers of the Parental Academic Institution, for the use of the hall.

(vii) It was moved by W. R. Fenwick, and seconded by Mr. M. Crow :

That the thanks of the Meeting be given to the Chairman, for the able manner in which he has discharged the duties of the chair.

Subscription books were handed round, and Donations to the amount of 900 Rupees were entered."

'Calcutta Gazette', 9. 1. 1832.

*

এই বিবরণে যে ছবিটির প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে সেটির খোঁজ মেলেনা। ডিরোজিওর যে একমাত্র ছবিটি প্রচারিত সেটি ইংরেজ শিল্পী বেনেট ১৮৪৩ সালে এঁকেছিলেন। তাঁর স্মৃতিরক্ষায় যে অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল তার পরিণতি সম্বন্ধে এই খবর মেলে :

"The sum of money collected for a Monument over his [Derozio's] grave was about 800 rupees. The amount was misappropriated, and Derozio's grave is now undistinguished among the crowded tombs of the Park Street Cemetry."

: 'The Bengal Obituary,' 1848.

এই সমাধির পুনরুদ্ধার এবং নূতন ভাবে তার সংস্কার করার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৮ সালের ১৮ এপ্রিল তারিখে একটি প্রস্তর ফলক আবার প্রতিষ্ঠা করেছেন সেখানে। এই উপলক্ষে যে স্মরণ সভা হয় তার একটি বিবরণী এখানে উদ্ধৃত করা হল :

ডিরোজিও জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

"ডিরোজিও ছিলেন মহান বাঙালী, মহান ভারতীয়। তিনি ছিলেন মহান কবি, যুক্তিবাদী দার্শনিক ও জন্ম-বিপ্লবী। তাঁর কাছে শুধু বাঙালী নয়, সারা ভারত ঋণী। কিন্তু খুবই দুঃখের কথা যে, উনবিংশ শতাব্দীর এই কালান্তরের পথিক ডিরোজিওর স্মৃতি ও কর্মজীবন নিয়ে সরকারী তরফে এতদিন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। আমাদের সরকার সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করে এই প্রথম তাঁর সমাধিভূমি সংস্কার ও তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করেছে। এ জন্য আমরা নিজেরাই ধন্য হয়েছি।

১৮ এপ্রিল, ১৯৭৮ কলকাতার দক্ষিণ পার্ক স্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে এক বৃষ্টিভেজা বিকালে ডিরোজিওর ১৭০তম জন্মদিবসের অনুষ্ঠানে রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী উপরোক্ত মন্তব্য করেন। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন যৌবনদৃপ্ত কবির কর্মজীবন আলোচনা করে তিনি আরও বলেন, এতবড় মানবতাবাদী দার্শনিক-কবির অকালমৃত্যু বড়ই বেদনার। রাজা রামমোহন ও বিবেকানন্দের কর্মময় জীবন ও উদ্যমের সঙ্গেই কেবল তাঁর তুলনা চলে। ডিরোজিওর কর্মজীবনের পরিধি ছিল মাত্র পাঁচ বছর, এই সামান্য কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচারসর্বস্ব বাঙালী জীবনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের মতই তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক ও মানবদরদী।

প্রধান অতিথি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করা হয়। তিনি ডিরোজিওর জন্ম তারিখ সম্পর্কে সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য দেন এবং হিন্দু কলেজে তাঁর অধ্যাপনার সময়সীমাও নির্ধারণ করে জানান। এই দুটি বিষয়েই কিছু তথ্যগত ভুল চলে আসছিল। ডঃ মজুমদার ডিরোজিওর মূল্যায়ন করে লেখেন, ডিরোজিও বাঙালী যুব-সমাজের মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধারার বীজ বপন করেন। স্বাধীনতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও দেশপ্রেমের মনোভাব ছাত্রদের মনে জাগিয়ে তুলবার এক দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন ডিরোজিও। তিনি অনেক দেশাত্মবোধক কবিতা লেখেন। ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষের আগে ভারতবর্ষে অন্য কেউ দেশাত্মবোধক কবিতা লিখেছেন বলে জানি না।

অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস বলেন, ডিরোজিও সবরকম সংকীর্ণ মতবাদের উর্ধ্বে ছিলেন। যা চিরন্তন ও মানবীয় তার চর্চাতেই তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন।

অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদার বলেন, ডিরোজিও ছিলেন মানবমিত্র। মানবতাবাদের সুস্থ গুণগুলি তিনি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়ে গিয়েছেন। আজকের বিহ্বল যুব-সমাজ যদি ডিরোজিও-চর্চা করেন তবে বহু সংকীর্ণতা ও নীচতা থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

শ্রীউইলসন ডিরোজা বলেন, সত্যিকার বাঙালী ও ভারতীয় ছিলেন বলেই ডিরোজিও অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। মানুষকে মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা করতে তিনি শিখিয়ে গিয়েছেন।

বর্তমান রাজ্য সরকার যে ডিরোজিওর স্মৃতিরক্ষায় আগ্রহী হয়েছেন সেই উদ্যোগকে অভিনন্দন জানিয়ে সভাপতি অধ্যাপক ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন, ডিরোজিওকে ভুলে যাওয়া বা উপেক্ষা করা জাতীয় জীবনে আত্মহত্যার শামিল। তিনি প্রথম আমাদের যুব-সমাজের চোখে নতুন উষার স্বর্ণদ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তাঁর ভাবনার উত্তরসূরী হয়েই আজ আমরা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছি! এই যুক্তিবাদী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদী কবি আমাদের জড়-জীবনকে নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রাণপাত করেছেন। তিনি ইঙ্গ-ভারতীয় কবিতার জনক। তিনি ছিলেন মহান আদর্শবাদী শিক্ষক, ছাত্রগতপ্রাণ। দেড়শো বছর আগে ডিরোজিও যে প্রগতিশীল, সংস্কারমুক্ত ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পরিচয় রেখেছিলেন, আজকের দিনের মানুষও তা কল্পনা করতে পারেন না। বাঙালী জাতির দুর্ভাগ্য যে, তাঁর মত মানুষকে তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ডিরোজিও সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি যিনি স্বাধীনতা কি বস্তু তা বাঙালী জাতিকে শিখিয়ে গিয়েছেন।"

'পশ্চিমবঙ্গ' : ২৮.৪.১৯৭৮

*

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এরপরে ডিরোজিওর স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি কাহিনী চিত্র প্রযোজনা করেন, যার কাহিনী রচনা এবং পরিচালনা করেছেন শ্রীউৎপল দত্ত। ১৯৭৮ সালের ২৪ মে তারিখে কলকাতা তথ্য কেন্দ্রের শিশির মঞ্চে এর নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়। চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়ে প্রথম প্রদর্শিত হয় দক্ষিণ কলকাতার মেনকা প্রেক্ষাগৃহে ১৯৭৯ সালের ২০অক্টোবর সকালে। ১৯৮২ সালের জানুয়ারী

মাসের প্রথম সপ্তাহে এর প্রথম বাণিজ্য-ভিত্তিক প্রদর্শনী শুরু হয়। ডিরোজিওর জীবন নিয়ে তৈরী ছবিরও এভাবে দীর্ঘদিন মুক্তি না-পাওয়া-অবস্থায় প্রতীক্ষারত থাকা আমাদের সাংস্কৃতিক আত্মশ্লাঘাকে অবশ্যই আহত করে!

*

ডিরোজিওর জীবন নিয়ে নির্মিত কাহিনী চিত্র 'ঝড়'-এর 'মহরৎ-এর পরিবর্তে' অনুষ্ঠিত সভার নিমন্ত্রণ লিপি ঃ

"যথা বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং

প্রাতঃস্মরণীয় হেনরি ডিরোজিওর কর্মময় জীবনের শেষ দুইটি বৎসর অবলম্বনে কাহিনীচিত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রয়োজিত ঝড় নির্মাণ কার্য সূচনা আসন্ন ॥

তদুপলক্ষ্যে আগামী ২৪ শে মে, বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় শিশির মঞ্চে [ইনফর্মেশন সেণ্টার] একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ সভায় যুগস্রষ্টা ডিরোজিওর কবিতা পাঠ, তদসম্পর্কে আলোচনা, সমসাময়িক পত্রিকা পাঠ এবং ঝড় চলচ্চিত্রের শিল্পী ও কুশলীবৃন্দের পরিচয় প্রদান করা হইবে ॥

মহাশয় সবান্ধবে ঐদিন সভাগৃহে উপস্থিত হওতঃ ডিরোজিও সন্ধ্যা সফল করিতে অধীনদিগে সাহায্য করিবেন এইমাত্র নিবেদন ॥

ইতি

ঝড় চলচ্চিত্রের কর্মীবৃন্দের পক্ষে

উৎপল দত্ত ॥"

*

মহরৎ-এর পরিবর্তে

"ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতে মুক্তচিন্তা, স্বাধীনতা, বিশ্বমানবতা ও বিদ্রোহের ঝড় তুলেছিলেন হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। হিন্দু কলেজে অধ্যাপনার সময় তাঁর ছাত্রবৃন্দের কাছে তিনি ছিলেন আদর্শ পুরুষ। তাঁর চিন্তাধারার অনুগামী হয়ে তাঁরা কলকাতার রক্ষণশীল সমাজে তুমুল আলোড়ন ফেলেছিলেন। কিন্তু মাত্র ২২ বছর ৮ মাস বয়সে ডিরোজিও কলেরায় মারা যান। সেই স্মরণীয় মানুষটির জীবন, কবিতা, রচনা ও গান নিয়ে একটি অভিনব

'ডিরোজিও সন্ধ্যা' অনুষ্ঠিত হল ২৪ মে তারিখে শিশির মঞ্চে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত ও উৎপল দত্ত রচিত ও পরিচালিত নির্মীয়মান 'ঝড়' ছবির এটি ছিল মহরতের বিকল্প অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং ডিরোজিও, তাঁর বোন এমিলিয়া এবং ডিরোজিওর বিখ্যাত শিষ্যবর্গ এবং তৎকালীন হিন্দু ও মুসলমান সমাজের নায়কেরা। প্রত্যেকেই তাঁদের নিজস্ব পোশাকে। আসলে তাঁরা ছায়াছবির অভিনেতা, দর্শকদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। মঞ্চের মাঝখানে সাদার উপর কালো রেখায় আঁকা ছিল টেবিল সংলগ্ন চেয়ারে উপবিষ্ট ডিরোজিও। দু পাশে কালো পর্দায় জলজলে অক্ষরে লেখা তাঁর কয়েকটি উদ্ধৃতি। মঞ্চের এক কোণে পাঞ্জাবী পায়জামা পরিহিত উৎপল দত্ত ডিরোজিওর জীবনভাষ্য পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান পরিচালনা করছিলেন। ডিরোজিওর জীবন ও চিন্তাধারা ক্রমশ ধারাবিবরণী, তাঁর কবিতা ও গানের মধ্য দিয়ে একাত্ম হয়ে উঠছিল। একটি প্রতিভাময় জীবন আর মুক্তচিন্তা ও বিদ্রোহের শাণিত আহ্বান। মাঝখানে চার্লস ও'ব্রয়েন ও ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত ডিরোজিও সম্পর্কে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির মধ্যে এমন একটি গভীর আন্তরিকতা, অভিনবত্ব ও চমৎকারিতা ছিল যা দর্শকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সারা প্রেক্ষাগৃহ ছিল দর্শকে পরিপূর্ণ। বাইরে যে ঝরঝর বৃষ্টি পড়ছে, সেদিকে কারো খেয়ালই ছিল না। মহরতের এমন মর্মগ্রাহী বিকল্প চিত্রজগতের এক বিরল অভিজ্ঞতা। 'ঝড়' ডিরোজিওর জীবনের শেষ দু'বছরের কাহিনী। 'ডিরোজিওর ভূমিকায় অভিনয় করবেন উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, এমিলিয়া ডিরোজিও হবেন সাগরিকা অধিকারী, মা আনা ডিরোজিও হচ্চেন ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়। ডিরোজিওর বিখ্যাত শিষ্যবর্গের রূপায়ণে থাকছেন কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকুমার বিশ্বাস, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দত্তগুপ্ত, গৌতম চক্রবর্তী, দেবাশিস দাশগুপ্ত, মলয় বিশ্বাস, ভবতোষ দত্ত, অলোক খাস্তগীর প্রভৃতি। পরিচিত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে আছেন রবি ঘোষ, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের নায়ক রাধাকান্ত দেবের ভূমিকায় অভিনয় করবেন উৎপল দত্ত। সংগীত পরিচালনা করছেন প্রশান্ত ভট্টাচার্য। চিত্রগ্রহণ করবেন দীনেন গুপ্ত, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় দায়িত্ব নিচ্ছেন সম্পাদনার এবং শিল্পনির্দেশনায় সূর্য চট্টোপাধ্যায়। কি. কু. রা."

'আনন্দলোক' : ১০. ৬. ৭৮

ডিরোজিওর জীবনাবসানের দেড়শ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে যে স্মরণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সম্প্রতি তাঁদের উদ্যোগে এবং কলকাতার পুরসভার সৌজন্যে, ১৯৮১ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে ১৫৫, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের [দেড়শ বছর আগে ডিরোজিওর ঐখানেই জীবনাবসান হয়] বাড়িতে এবং ২৬শে ডিসেম্বর [তাঁর ১৫০-তম প্রয়াণ দিবস] পার্ক স্ট্রিট সমাধিভূমির প্রবেশপথে দুটি স্মারক ফলক লাগানো হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দুটি ফলকেই তাঁর জন্মসাল ১৮০৮ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ তথ্য বিতর্ক-সাপেক্ষ। ডিরোজিও স্মরণ সমিতি তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবও করেছেন, যেগুলি বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য :

ডিরোজিও স্মরণ সমিতি

১৩/সি ফর্ডাইস লেন

কলিকাতা-১৪

উনিশ শতকের মহত্তম শিক্ষক, যুক্তিবাদের পথিকৃৎ, দেশপ্রেমের আদি কবি, ক্রীতদাসত্ব-বিরোধী প্রবল যোদ্ধা, সতীদাহ-বিরোধী প্রবল কবিকণ্ঠ, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীন নেতা হেনরী ডিরোজিওর ১৫০তম প্রয়াণ উপলক্ষ্যে দেশের আপামর জনগণের কাছে আমাদের আবেদন যে নিম্নলিখিত কার্যক্রম-গুলি গ্রহণ করে একটি অনন্য আদর্শবাদী মানুষের স্মৃতিকে অমর করার প্রয়াসকে সার্থক করে তুলুন।

(১) তাঁর স্মৃতিযুক্ত বাড়ীর সামনে প্রস্তর ফলক লাগিয়ে এই স্থানটিকে স্মরণীয় করা (১৫৫, আচার্য জগদীশ বসু রোড)।

(২) মৌলালীস্থিত নবগঠিত যুবকেন্দ্রটিকে "ডিরোজিও ভবন" বলে আখ্যাত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করা।

(৩) পৌরসংস্থা তাঁর নামে রাস্তা নামকরণের ব্যবস্থা যাতে সত্বর গ্রহণ করে তার জন্য অনুরোধ করা।

(৪) পার্ক ষ্ট্রীট সমাধিস্থলের কাছে কবি মধুসূদনের অনুরূপ একটি স্মৃতিতোরণ করার জন্য কলকাতা পুরসভাকে অনুরোধ করা।

(৫) সংবাদপত্রে দেশের গুণীজন—স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতি প্রচার করা।

(৬) হিন্দু কলেজে অর্থাৎ প্রেসিডেন্সী কলেজে একটি মর্যাদাপূর্ণ স্মরণ সভা, সেমিনারের আয়োজন করা।

(৭) তাঁর সমগ্র রচনাকে প্রকাশ করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা।

(৮) প্রদেশে প্রদেশে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, সংস্কৃতি কেন্দ্রে হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর অসাধারণ জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা সভা আহ্বান করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা।

শ্রীশিবেন্দু চক্রবর্তী	**ডঃ সুকুমার সেন**	**শ্রীজিতেন পাল**
শ্রীফাল্গুনী মিত্র	**শ্রীরাধারমণ মিত্র**	সম্পাদক
(যুগ্ম-আহ্বায়ক)	**ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য**	জাতীয় সাহিত্য সংঘ

*

ডিরোজিওর জীবনাবসানের দেড়শ বছর উপলক্ষে স্মৃতিসভা

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

"কলকাতা, ২৭শে ডিসেম্বর – হেনরী ডিরোজিওর প্রয়াণের দেড়শ বছর পূর্তি উপলক্ষে পার্ক ষ্ট্রীট সমাধি ক্ষেত্রে একটি স্মরণসভা গতকাল সকালে অনুষ্ঠিত হয় ডিরোজিও স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত। সভার প্রারম্ভে রাজ্য সরকার কর্তৃক সংস্কারকৃত ডিরোজিওর সমাধির উপরে মাল্যদান করেন প্রবীণ গবেষক রাধারমণ মিত্র, রাজ্য সরকারের সংস্কৃতি-অধিকর্তা সন্তোষ চক্রবর্তী এবং পৌরসভার পক্ষে বারীন চট্টোপাধ্যায়। পৌর সভার উদ্যোগে সমাধিক্ষেত্রের প্রবেশপথে একটি স্মৃতিস্তম্ভও স্থাপিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে সেটির উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য। সভায় আলোচনা ও কাব্যপাঠ করেন রাধারমণ মিত্র, ডঃ ভট্টাচার্য, মুকুর সর্বাধিকারী, অমর দত্ত এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ বিজয় বসাক ও সভাপতি। সভায় ডিরোজিওর স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে কলকাতার একটি রাস্তা তাঁর নামে নামাঙ্কিত করা, তাঁর সম্পর্কে আলোচনা সভা ও তাঁর রচনা সংগ্রহ

প্রকাশ করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশের অনুরোধ করা উল্লেখযোগ্য।

ইতিপূর্বে গত ২০ শে ডিসেম্বর সকাল ৯টায় ১৫৫ নং আচার্য জগদীশচন্দ্র রোডে ডিরোজিওর স্মরণে প্রস্তর-ফলক স্থাপন করা হয়। এই উপলক্ষে এই দিনও এক অনুষ্ঠান হয়। শিবেন কাঞ্জিলাল সভাপতিত্ব করেন। বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। কানাই বসু প্রস্তর-ফলক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে শিবেন কাঞ্জিলাল, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুর সর্বাধিকারী প্রমুখ ডিরোজিও প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। এখানে উল্লেখ্য, ১৫৫ নং আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোডের বাড়িতে ১৮৩১ সালে ২৬শে ডিসেম্বর ডিরোজিওর জীবনাবসান হয়েছিল।"

'গণশক্তি' : ২৭.১২.১৯৮১

*

সম্প্রতিকালে ডিরোজিও সম্পর্কিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বইয়েরও পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে : E.W. Madge-এর 'Henry Derozio the Eurasian Poet and Reformer' (1905) নতুন করে প্রকাশ করেছেন অধ্যাপক সুবীর রায়চৌধুরী। F. B. Bradley-Birt-এর 'Poems of Henry Louis Vivian Derozio' (1923) এবং Thomas Edwards-এর 'Henry Derozio: The Eurasian Poet, Teacher and Journalist' (1884) বই দুটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে প্রবীণ অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকা সহ। 'পশ্চিমবঙ্গ' ও 'দিগদর্শন' পত্রিকা দুটিতে ড. কুমুদকুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক তপোবিজয় ঘোষ এবং বর্তমান লেখকের কয়েকটি নিবন্ধও বেরিয়েছে। অন্যান্য পত্রপত্রিকাতে এবং বুদ্ধিজীবী মহলে ডিরোজিও সম্বন্ধে সাধারণ ভাবেই আগ্রহ বেড়েছে ইদানীং। যোগেশচন্দ্র বাগলের 'ডিরোজিও', বিনয় ঘোষের 'বিদ্রোহী ডিরোজিও'-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হওয়াও ঐ আগ্রহেরই পরিচয়বাহী। সম্ভবত সেই কারণেই এই বইয়েরও নূতন সংস্করণ এত তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হল॥

*

একাত্তর পাতার প্রথম অনুচ্ছেদের শেষ কথাটি হল 'প্রমা-প্রতীতি' ; একাশি পাতার অধ্যায়-শিরোনাম 'তথ্যসূত্র ও প্রাসঙ্গিকী' ; একশ ছাব্বিশ পাতার দ্বিতীয় কবিতাটির নাম 'Dust' ; একশ একচল্লিশ পাতার প্রথম কবিতার শেষ চরণটি হল, "শুধু ফুল, তারা নয়—জীবনে সুন্দর আরো কবিতার কণা।"

উনিশ শতকের বাংলাদেশে নতুন যুগের চেতনা সৃষ্টির অন্যতম প্রধান প্রাণপুরুষ হেনরী ডিরোজিও তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের মধ্যেই আমাদের ইতিহাসে এক প্রবল আলোড়ন তুলেছিলেন। এই বইটি তাঁর কর্মজীবন এবং চিন্তাজীবন সম্বন্ধে একটি তথ্যনিষ্ঠ ও প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গণ্য হবে। ডিরোজিওর জীবন, সৃষ্টি এবং সাধনা সম্বন্ধে বিদগ্ধ ও বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে উনিশ শতকের বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির অনাবিষ্কৃত দিগন্তের উপর নানা দিক থেকে নূতন আলোকপাত করা হয়েছে এর মধ্যে। মাত্র দু' বছরের মধ্যে বইটির নূতন সংস্করণের প্রয়োজন হয়ে পড়া, এর অসামান্য জনপ্রিয়তারই প্রমাণ রাখে। ডিরোজিওর বিলুপ্তপ্রায় কিছু নিবন্ধ, নির্বাচিত কতকগুলি কবিতা ও তাদের নিখুঁত অনুবাদ, এ যাবৎ অব্যবহৃত দুষ্প্রাপ্য কিছু প্রামাণিক দলিল এবং নূতন কয়েকটি অধ্যায় এই সংস্করণের গুরুত্ব আরো বাড়িয়েছে। ডঃ পল্লব সেনগুপ্তের প্রায় দুই দশকের গবেষণা ও পরিশ্রমের ফসল এর মধ্যে উপস্থিত করা হয়েছে।